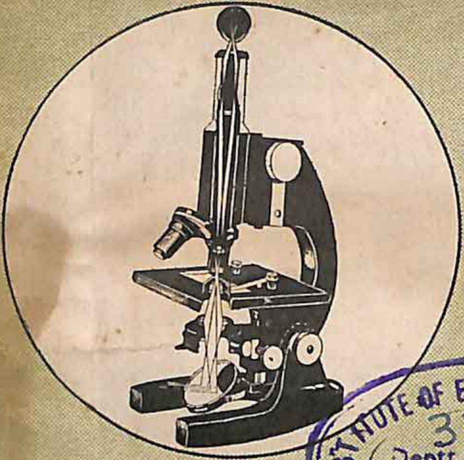


সরল প্রাণ বিজ্ঞান

রবীন্দ্র নারায়ণ পাল
সুপ্রকাশ রায়চৌধুরী

• অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য •



এ্যালায়েড বুক এজেন্সি • কলিকাতা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ-এর ১৯৭৪ সালের নূতন পাঠ্যক্রম অনুসরণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত।
[পর্ষৎ-এর ৭/৭/৭৩ তারিখের ১০০১৫/সি পত্র দ্রষ্টব্য।]

সরল প্রাণবিজ্ঞান

[অষ্টম শ্রেণী]

অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ পাল
বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদবিদ্যা, শ্রীচৈতন্য কলেজ ;
পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

ডঃ সুপ্রকাশ রায়চৌধুরী
বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা, বঙ্গবাসী কলেজ (সান্ধ্য) ;
পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এ্যালায়েড বুক এজেন্সী
১৮/এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
বি. সরকার
এ্যালায়েড বুক এজেন্সী
১৮/এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫
সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৫

ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্পমূল্য আংশিক কাগজে এই পুস্তকটি মুদ্রিত।
পুস্তকের মুদ্রিত মূল্যের উপর অতিরিক্ত মূল্য গ্রাহ্য হইবে না।

মূল্য : চার টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর :
শ্রীগোপাল চন্দ্র পান
দি শ্রীধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

॥ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ॥

ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম শ্রেণীর জন্য লিখিত 'সরল প্রাণবিজ্ঞান' শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থী কর্তৃক সমভাবে আদৃত হওয়ায় আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ অষ্টম শ্রেণীতেও নতুন পাঠ্যক্রম চালু করার অনুকূলে মত ব্যক্ত করায় ছাত্র-ছাত্রীর যথেষ্ট উপকার হয়েছে। এতে পাঠ্যক্রমের সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সহজ হবে। কেননা অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে এমন কতকগুলি বিষয় নির্দিষ্ট আছে যা প্রাণবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের গঠন, কলাস্থান, কলা, অঙ্গ, নানান তন্ত্র, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। উল্লিখিত বিষয়সমূহে প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে, নবম শ্রেণীর পাঠ শিক্ষার্থীর কাছে যে সহজবোধ্য হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এইসব কারণে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অধিকতর দুরূহ হলেও তাকে সহজবোধ্য করে পরিবেশন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে যথাযোগ্য স্থানে চিত্র সংযোজন করতে কোনরূপ কার্পণ্য করা হয়নি। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর বই দুটির মত এই বইটিও সমাদর লাভ করলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব। বইটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করার জন্য যে কোন গঠনমূলক সমালোচনা আদরে গৃহীত হবে।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ পাল
ডঃ সুপ্রকাশ রায়চৌধুরী

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥

অধিকাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষ অষ্টম শ্রেণীতে এ বৎসর থেকেই নতুন পাঠ্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। নতুন পাঠ্যক্রম অনুসরণে কতদূর উপকার পেলেন তা ছাত্র-ছাত্রী নিজেরাই নবম শ্রেণীতে উঠে উপলব্ধি করতে পারবে। সুসংবদ্ধ পাঠ্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা একথাটি উপলব্ধি করে অষ্টম শ্রেণীতেও প্রাণবিজ্ঞান চালু করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। যথাসম্ভব ভুলত্রুটিমুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁদের হাতে অল্প সময়ের মধ্যে তুলে দিতে পেরে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করছি।

ভবিষ্যতেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট হতে গঠনমূলক সমালোচনা আহ্বান করছি

গ্রন্থকারদ্বয়

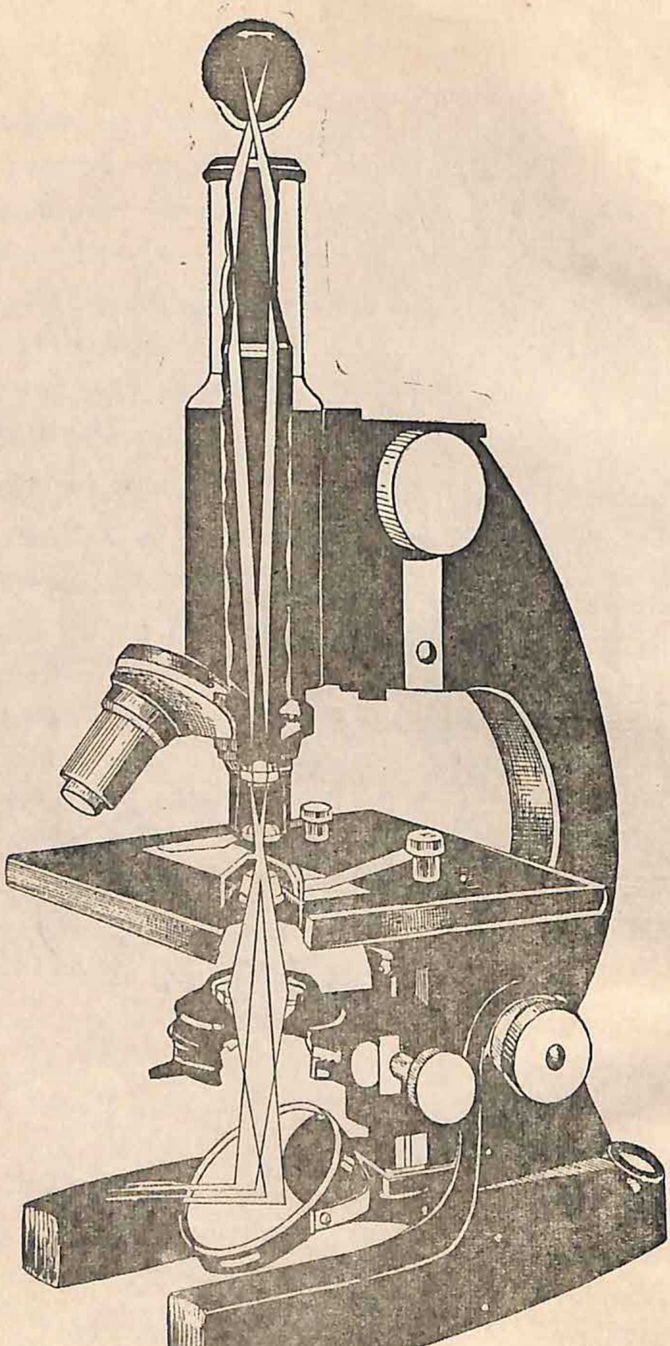
SYLLABUS IN LIFE SCIENCE

CLASS VIII

1. Structure of plant and animal cells.
2. Histology—Plant tissue, structure of stem (dicot and monocot), root (dicot and monocot) and leaf. (10 pages)
3. Animal tissues and organs. (15 pages)
4. Outline idea of different systems with functions :—
   (a) Invertebrate—cockroach and earthworm. (15 pages)
   (b) Vertebrate—toad (frequent reference will have to be made to the organ systems in human being. (20 pages)
5. Phenomenon of diffusion, osmosis, absorption, conduction and transpiration in plants. (15 pages)
6. Students should acquire individual experience by experimentation on the following items :

   Section of Stem, root and leaf. External structure of cockroach. External structure and general viscera of toad. (10 pages)

॥ সূচীপত্র ॥

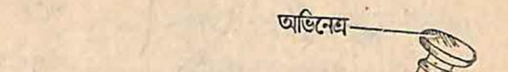


আধুনিক যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

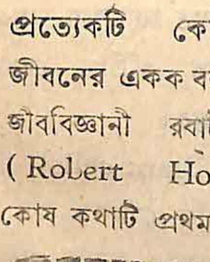
১ উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের গঠন

[Structure of plant and animal cells]

বাড়ী তৈরীর প্রধান উপাদান ইট। অসংখ্য ইট নানাভাবে সাজালে তবেই সুন্দর সুন্দর বাড়ী গড়ে ওঠে। বাড়ীর প্রতিটি ইট হল এক একটি "একক" (unit)। তেমনি উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রত্যেকের দেহই এক বা একাধিক বিশেষ ধরনের একক দিয়ে গড়া। উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহের এই এককগুলোকেই বলে "কোষ" (cell)। দেহ গঠনে অপরিহার্য প্রত্যেকটি কোষকেই জীবনের একক বলা হয়। জীববিজ্ঞানী রবার্ট হুক (Robert Hooke) কোষ কথাটি প্রথম প্রয়োগ করেন।

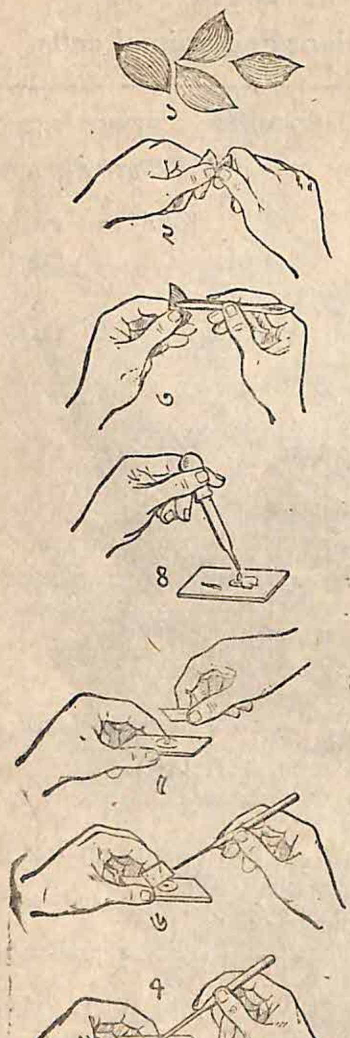


চিত্র নং ১—রবার্ট হুক যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন



চিত্র নং ২—বোতলের ছিপির প্রস্থচ্ছেদ (রবার্ট হুক যেমন দেখেছিলেন)

সুদূর অতীতে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট হুক-এর আবিষ্কার বিজ্ঞানী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। স্বউদ্ভাবিত একটি অত্যন্ত সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে একদিন তিনি বোতলের ছিপির একটি পাতলা ছেদ পরীক্ষা করছিলেন। অবাক হয়ে তিনি দেখলেন ঐ পাতলা অংশটি অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম "বাক্স" বা "প্রকোষ্ঠে"র সমষ্টিমাত্র। তখনই তিনি প্রত্যেকটি তথাকথিত বাক্সের নাম দিলেন কোষ। এর কারণ হল ঐ সময় তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল এমন সব ঘনক্ষেত্র (cubicle) সন্ন্যাসী আবাসের কথা যেগুলোর আকৃতি ছিল অনেকটা এদেরই মত।



চিত্র নং ৩—পেঁয়াজের আঁশ তুলে স্লাইড তৈরীর পদ্ধতি

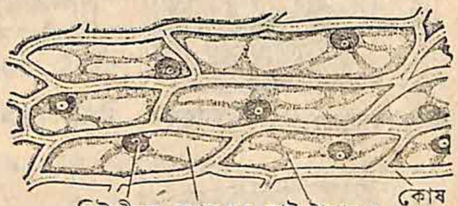
আধুনিক কালে উন্নত ধরনের নানান অণুবীক্ষণ যন্ত্র পাওয়া যায়। তাই তোমাদের মত ছোট ছোট শিক্ষার্থীরাও রবার্ট হুক-এর ঐ একই পরীক্ষা অতি সহজে করতে পার। হুক-এর অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে, কোষের সব কিছু খুঁটিয়ে দেখা তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি কেবল কোষের দেওয়ালগুলিই দেখেছিলেন। তাঁর পরীক্ষার অনেক পরে জানা গেল যে ঐ **প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত জীবন্ত পদার্থ।** আজকের দিনে উন্নত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোষকে খুঁটিয়ে দেখা তোমার পক্ষেও সম্ভব।

উদ্ভিদকোষ [Plant cell]

একটা পেঁয়াজ যোগাড় কর। ছবিতে যেভাবে দেখান হয়েছে সেই-ভাবে পেঁয়াজের আঁশ তুলে একটা স্লাইড তৈরী কর। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে দেখ ঐ অংশটায় রয়েছে অসংখ্য ঘনসন্নিবিষ্ট কোষ। প্রতিটি কোষ যেন এক একটি আয়তক্ষেত্র। এদের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থূলতা রয়েছে। প্রতিটি কোষ বাইরের দিকে পাতলা, স্বচ্ছ, নির্জীব আবরণে ঢাকা। এই আবরণকেই বলে কোষপ্রাকার (Cell wall)। কোষপ্রাকার কোষের

ভিতরের জীবন্ত অংশকে রক্ষা করা ছাড়া কোষের আকৃতি ও দৃঢ়তা দান করে। কোষপ্রাকারের মধ্যবর্তী জীবন্ত পদার্থটিকে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) বলে। প্রোটোপ্লাজমের প্রধান অংশ দুটো। অপেক্ষাকৃত ঘন ও গোলাকার অংশটিকে বলে নিউক্লীয়স্ (Nucleus)। নিউক্লীয়সকে ঘিরে থাকা প্রোটোপ্লাজমের অংশটিকে বলে সাইটো-প্লাজম (Cytoplasm)।

নিউক্লীয়স হল "কোষের মগজ"। কারণ, কোষের সব কাজ নিউক্লীয়সই নিয়ন্ত্রণ করে। ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করলে নিউক্লীয়সের অংশগুলো ভালভাবে দেখা যায়। যে সূক্ষ্ম পর্দা দিয়ে নিউক্লীয়স ঢাকা থাকে তার নাম নিউক্লীয় ঝিল্লি (Nuclear membrane)। প্রোটো-প্লাজমের যে অর্ধতরল অংশকে এটি ঘিরে রাখে তাকে বলা হয় নিউক্লীয়-প্লাজম (Nucleoplasm)। নিউক্লীয়প্লাজমের মধ্যে যেসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতোর মত পদার্থ জালের আকারে ছড়িয়ে থাকে সেগুলো হল নিউক্লীয় জালিকা (Nuclear reticulum)। কোষ ভাগ হওয়ার সময় নিউক্লীয় জালিকা যেসব ছোট ছোট খণ্ড গঠন করে সেগুলোকে বলে ক্রোমোজোম (Chromosome)। এইসব ক্রোমোজোমই বংশ-পরম্পরায় বংশধারার মূল উপাদান বয়ে নিয়ে যায়। এছাড়া, নিউক্লীয়সের মধ্যেও আবার একটি গোলাকার বিশেষ ঘন অংশ থাকে। এটিকে বলে নিউক্লীওলস (Nucleolus)।

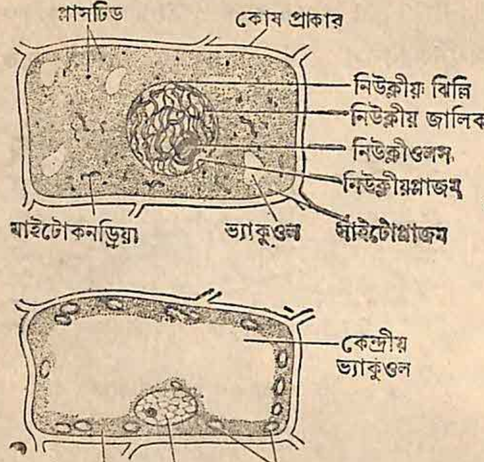


চিত্র নং ৪—অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পেঁয়াজের আঁশ যেমন দেখায়

তোমার তৈরী স্লাইডে এবার আয়োডিন রং ছোঁয়াও। দেখ নিউক্লীয়সটি হল কাল বাদামী আর বাকি অংশ হল স্বর্ণাভ হলুদ।

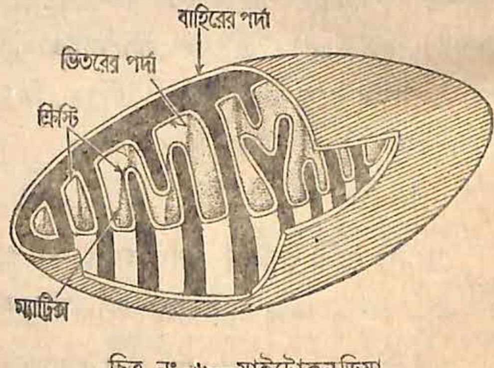
সাইটোপ্লাজমে তরল রসে ভরা একাধিক গহ্বর রয়েছে। এদের বলে ভ্যাকুওল বা কোষগহ্বর (Cell vacuole)। কোষগহ্বরের মধ্যের

রসকে বলে **নিউক্লীয় রস** (Nuclear sap)। অপরিণত কোষে অসংখ্য **ভ্যাকুওল** বা কোষগহ্বর থাকে। কিন্তু পরিণত কোষে কোষগহ্বরগুলি মিলেমিশে একটি বড় **কেন্দ্রীয় ভ্যাকুওল** বা **কেন্দ্রীয় কোষগহ্বর** (Central Vacuole) সৃষ্টি করে। এর ফলে সাইটোপ্লাজম কোষ-প্রাকারের দিকে সরে গিয়ে পাতলা পর্দার আকারে অবস্থান করে।



চিত্র নং ৫ – উপরে অপরিণত ; নিচে পরিণত উদ্ভিদকোষ

সাইটোপ্লাজমে নানান ধরনের বস্তু ছড়ান আছে দেখা যায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বস্তুটি হল প্লাসটিড (Plastid)। উদ্ভিদকোষে প্লাসটিড থাকা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পাতার প্লাসটিডের রং সবুজ, ফুলের প্লাসটিডের রং লাল বা হলুদ, আর মাটির মধ্যে থাকা অংশগুলোর কোষের প্লাসটিডের কোন রং নাই। এগুলোকে যথাক্রমে ক্লোরোপ্লাসটিড (Chloroplastid), ক্রোমোপ্লাসটিড (Chromoplastid) ও লিউকোপ্লাসটিড (Leucoplastid) বলে।



চিত্র নং ৬—মাইটোকনড্রিয়া

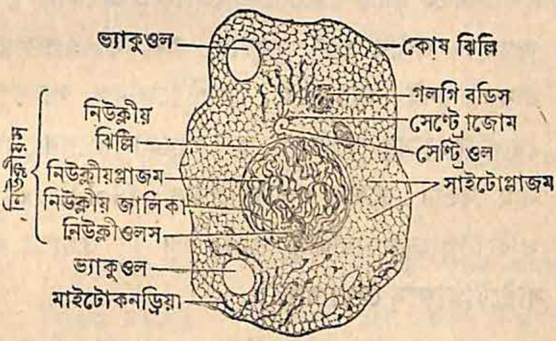
প্রতিটি কোষেই একটা করে "শক্তি ঘর" (Power house) আছে। কাজকর্ম করার

জন্যে এ থেকেই শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তি উৎপাদকগুলির নাম মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria)। একটি কোষে অনেক মাইটোকনড্রিয়া থাকে। এরা দেখতে সূতোর মত বা দানার মত।

প্রাণিকোষ

[Animal cell]

উদ্ভিদকোষের সঙ্গে প্রাণিকোষের প্রায় পুরোপুরিই সাদৃশ্য আছে। প্রাণিকোষের প্রোটোপ্লাজমও প্রধান দু'টি অংশে বিভক্ত। অংশ দু'টি হল সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লীয়স। সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে রাখা পর্দাটির নাম কোষ ঝিল্লি বা কোষ মেমব্রেন (Cell membrane)। কোষের ভিতরের অংশকে ঘিরে রাখলেও উদ্ভিদকোষের মত এটি নির্জীব নয়, সজীব। কোষের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের আনাগোনাকে এই ঝিল্লি নিয়ন্ত্রণ করে।



চিত্র নং ৭—একটি প্রাণিকোষ

নিউক্লীয়স হল কোষের মগজ। মগজই কোষের সব রকম কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লীয়সের বাইরের আবরণটিকে যথারীতি নিউক্লীয় ঝিল্লি বলে। এর ভিতরে অবস্থিত প্রোটোপ্লাজমের অংশকে বলে নিউক্লীয়প্লাজম। নিউক্লীয়প্লাজমের মধ্যে গোলাকার অংশটিও যথারীতি নিউক্লীওলস; আর তার বাইরের জালিকাকার পদার্থগুলি নিউক্লীয় জালিকা। পূর্বেই বলা হয়েছে কোষ ভাগ হওয়ার সময় ঐ জালিকাই কতকগুলো নির্দিষ্ট খণ্ডে ভেঙে গিয়ে ক্রোমোজোম গঠন করে। ক্রোমাটিন (Chromatin)

নামে এক প্রকার জটিল প্রোটীন দিয়ে ক্রোমোজোম গঠিত। ক্রোমাটিন অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক অদ্ভুত পদার্থ। এর দ্বারাই জীবের বংশ-গতির নিয়ন্ত্রণ ঘটে। প্রতিটি জীবের ক্রোমোজোমের সংখ্যা থাকে নির্দিষ্ট। মানুষের দেহে সর্বমোট ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম আছে।

উদ্ভিদকোষের তুলনায় প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজমে অনেক বেশী কিন্তু ছোট ছোট কোষগহ্বর আছে। এছাড়া আছে মাইটো-কনড্রিয়া ও অন্যান্য পদার্থ। অন্যান্য পদার্থের মধ্যে সেন্ট্রোজোম (Centrosome) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অংশটি নিউক্লীয়সের উপরে খুব নিকটে থাকে। সেন্ট্রোজোমে এক জোড়া সেন্ট্রিওল (Centriole) আছে। কোষ ভাগ হওয়ার সময়েই এগুলোকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। সেই সময় এই সেন্ট্রোজোমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেন্ট্রোজোমের চারদিকে কতকগুলো বিশেষ বস্তু দেখা যায়। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে গলগি বডিস (Golgi bodies)। এইসব পদার্থ সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত সজীব বস্তু। এছাড়া কতকগুলি নির্জীব পদার্থও সাইটোপ্লাজমে দেখা যায়।

উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের পার্থক্য

[Difference between plant cell and animal cell]

উদ্ভিদকোষ	প্রাণিকোষ
১. কোষপ্রাকার নির্জীব।	১. কোষের কোন নির্জীব প্রাকার নেই, আছে সজীব পর্দা।
২. প্লাসটিড আছে।	২. প্লাসটিড নেই।
৩. সেন্ট্রোজোম নেই।	৩. সেন্ট্রোজোম আছে।
৪. কোষগহ্বর বড় ও অল্প।	৪. কোষগহ্বর ছোট ও অনেক।

২

কলাস্থান
[Histology]

কোষ যে জীবকোষের একক তা আমরা জেনেছি। এবার জানা দরকার জীবদেহ এক বা একাধিক কোষের সমন্বয়ে গঠিত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে একটি কাণ্ড, পাতা বা মূলের ছেদ পরীক্ষা করলে দেখবে এগুলোর প্রত্যেকটাই বিশেষ বিশেষ কতকগুলো কোষ দিয়ে তৈরী। তবে সব কোষের গঠন, বা উৎপত্তি বা কাজ এক নয়। বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য কোষগুলো নিজেদের মধ্যে শ্রম বিভাগ করে নিয়েছে। উৎপত্তির দিক থেকে এক হয়েও সমান বা ভিন্ন আকৃতি লাভ করে একই কাজে নিযুক্ত থাকলে সেই কোষগুচ্ছকে বলা হয় কলা বা টিস্যু (Tissue)।

কলা সম্বন্ধে পঠনপাঠন প্রাণবিজ্ঞানের যে বিভাগে হয় তাকেই বলে কলাস্থান (Histology)।

কলা বহু রকমের। প্রত্যেক কলার নিজস্ব চরিত্রগত লক্ষণ আছে। এমনি এক ধরনের বা বিভিন্ন ধরনের কলা একত্র হয়ে কোন উদ্ভিদাংশ বা পুরো উদ্ভিদদেহ তৈরী হয়।

এক ধরনের কোষ দিয়ে তৈরী কলা হল সরল (Simple Tissue)। বিভিন্ন ধরনের কোষ দিয়ে তৈরী কলা হল জটিল (Complex Tissue)।

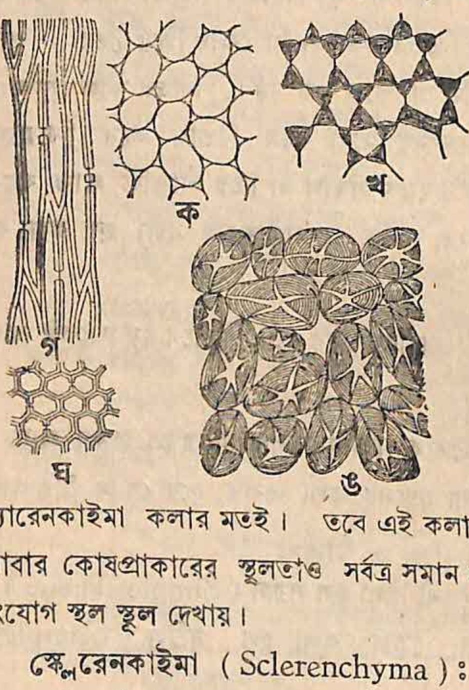
সরলকলা
[Simple tissue]

যখন একই আকৃতি-প্রকৃতির কোষ দিয়ে তৈরী কলা একই কাজ করে তাকে বলে সরলকলা।

সরলকলা তিন প্রকার: প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা।

প্যারেনকাইমা (Parenchyma) ঃ পাতলা কোষপ্রাকার বেষ্টিত সজীব কতকগুলি কোষ একত্রে প্যারেনকাইমা তৈরী করে। প্যারেনকাইমার কোষগুলি গোলাকার, ডিম্বাকার বা বহুভুজাকার হতে পারে। পাশাপাশি বিন্যস্ত থাকলে এইসব কোষের অন্তর্বর্তী স্থান (Intercellular space) ফাঁকা থাকে।

কোলেনকাইমা (Collenchyma) ঃ কোলেনকাইমা বহুলাংশে



চিত্র নং ৮—
ক—প্যারেনকাইমা
খ—কোলেনকাইমা
গ—লম্বচ্ছেদে স্ক্লেরেনকাইমা
ঘ—প্রস্থচ্ছেদে স্ক্লেরেনকাইমা
ঙ—বিশেষ ধরনের স্ক্লেরেনকাইমা

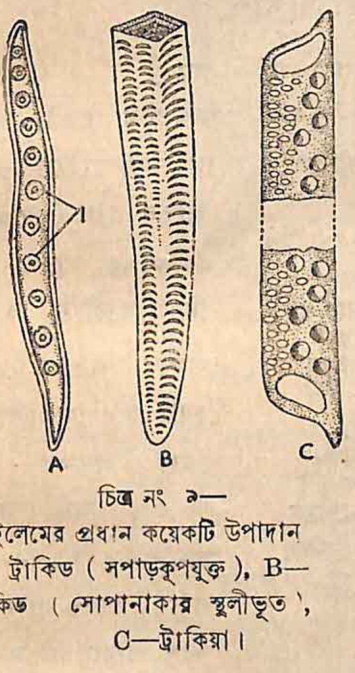
প্যারেনকাইমা কলার মতই। তবে এই কলার কোষগুলি কিছুটা লম্বাটে ; আবার কোষপ্রাকারের স্থূলতাও সর্বত্র সমান নয়। প্রস্থচ্ছেদে কোষগুলির সংযোগ স্থল স্থূল দেখায়।

স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma) ঃ স্ক্লেরেনকাইমা কলা যে সব কোষ দিয়ে তৈরী তাদের প্রাকার সমানভাবে স্থূল ও পরে কঠিন হয়। কোষগুলি বহুভুজাকার এবং এতে প্রোটোপ্লাজম থাকে না। প্রোটোপ্লাজম থাকে না বলেই কোষগুলি মৃত।

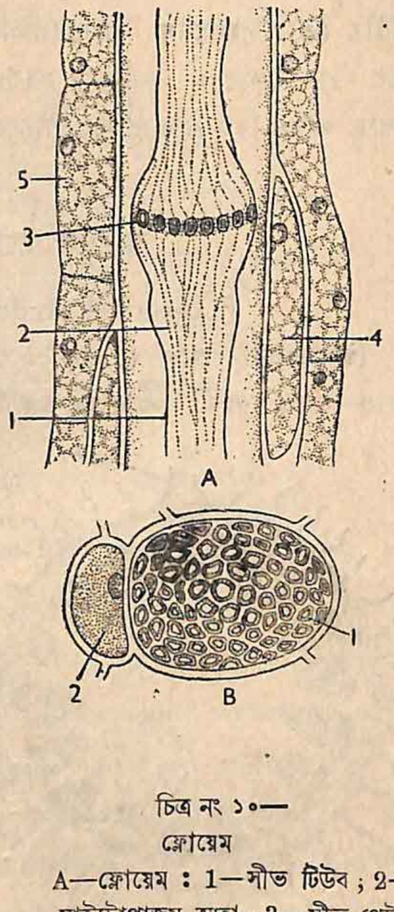
জটিলকলা
[Complex tissue]

উদ্ভিদদেহের জটিলকলা দিয়েই খাদ্য চলাচলের বিশেষ পথ তৈরী হয়। পথগুলিকে বলে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (Vascular bundle)।

প্রধানতঃ যে দু'ধরনের কলা দিয়ে জটিলকলা তৈরী তা হল জাইলেম (Xylem) ও ফ্লোয়েম (Phloem)। জাইলেম ও ফ্লোয়েম উভয়ই



চিত্র নং ৯—
জাইলেমের প্রধান কয়েকটি উপাদান
A ট্রাকিড (সপাড়কূপযুক্ত), B—ট্রাকিড (সোপানাকার স্থূলীভূত), C—ট্রাকিয়া।



চিত্র নং ১০—
ফ্লোয়েম
A—ফ্লোয়েম : 1—সীভ টিউব ; 2—সাইটোপ্লাজম সূতা ; 3—সীভ প্লেট ; 4—কমপ্যানিয়ন সেল ; 5—ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা। B – ফ্লোয়েমের প্রস্থচ্ছেদ : 1—সীভ প্লেট ; 2—কমপ্যানিয়ন সেল।

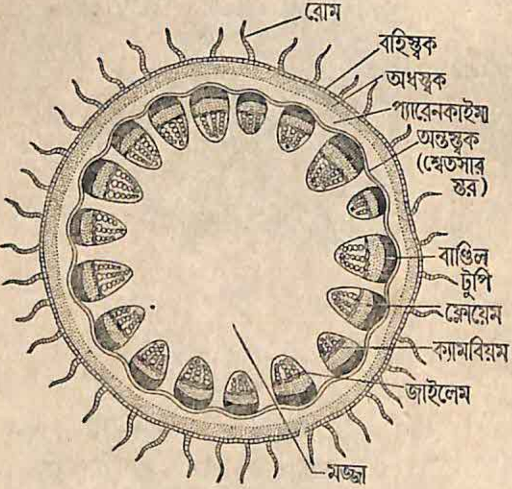
জটিলকলা। কারণ, জাইলেম বা ফ্লোয়েম প্রত্যেকেই চার রকমের বিভিন্ন কোষ দিয়ে তৈরী। জাইলেমের বিশেষ চারটি কোষ হল : (১) ট্রাকিড (Tracheid), (২) ট্রাকিয়া (Trachea or vessel), (৩) জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma) ও (৪) জাইলেম ফাইবার

(Xylem fibre)। এদিকে ফ্লোয়েমের চার ধরনের কোষ হল: (১) সীভ টিউব (Sieve tube), (২) কমপ্যানিয়ন সেল (Companion cell), (৩) ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem rarenchyma) এবং (৪) ফ্লোয়েম ফাইবার (Phloem fibre)। ভবিষ্যতে এগুলির সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

কাণ্ডের অভ্যন্তরীণ গঠন

[Internal structure of Stem]

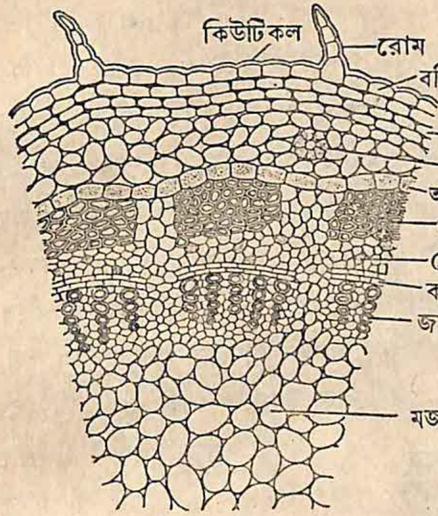
দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড (সূর্যমুখী): সূর্যমুখী ফুলগাছের একটা কচি কাণ্ড বেছে নাও। কাণ্ডটির একটি পাতলা প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে স্লাইডে রেখে আতস কাচ (Magnifying glass) দিয়ে পরীক্ষা কর। লক্ষ্য কর কাণ্ডের ছেদটি প্রায় গোলাকার। কেন্দ্র অংশের রং ফিকে; কিন্তু তার চারদিকের অংশের রং গাঢ়। তারও বাইরের অংশ আবার ফিকে।



চিত্র নং ১১—সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সূর্যমুখী কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

এখন স্লাইডটিকে একটি যৌগ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা কর। লক্ষ্য কর বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে কি কি কলা বিন্যস্ত আছে। ছেদটির বাইরের দিকে রয়েছে একস্তরে বিন্যস্ত ব্যারেলাকৃতি প্যারেনকাইমা। বাইরের এই স্তরকেই বলে **বহিস্ত্বক** বা **এপিডারমিস** (Epidermis)। এই স্তরের বাইরের পাতলা আবরণের নাম **কিউটিকল**। বহিস্ত্বক থেকে

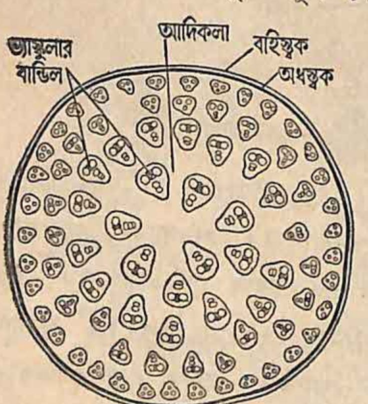
উঠেছে একাধিক বহুকোষী রোম। বহিস্ত্বকের নিচে রয়েছে বিশেষ একটি কলাস্তর। কোলেনকাইমা দিয়ে তৈরী কয়েক স্তর গভীর এই অঞ্চলকে



চিত্র নং ১২—প্রস্থচ্ছেদে সূর্যমুখী কাণ্ডের একাংশ

বলে অধস্ত্বক বা হাইপোডারমিস (Hypodermis)। এর নিচের অনেকটা অংশ দখল করে আছে প্যারেনকাইমা। 'অধস্ত্বকের একেবারে ভিতরের কোষস্তরটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যময়। এর বিন্যাস ঢেউ খেলান। এই স্তরটিকে বলে অন্তস্ত্বক বা এণ্ডোডারমিস (Endodermis)। সূর্যমুখী কাণ্ডের অন্তস্ত্বকে প্রচুর শ্বেতসার দানা আছে। সেজন্য একে শ্বেতসার স্তর (Starch sheath) বলা হয়। অধস্ত্বক, তার নিচের প্যারেনকাইমা এমনকি অন্তস্ত্বক পর্যন্ত অংশটিকে কর্টেক্স (Cortex) বলা হয়। কর্টেক্সের নিচে সুন্দরভাবে সাজান গাঢ় রং-এর অংশগুলিই ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল। প্রত্যেকটি ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের মাথায় আছে একটি করে স্ক্লেরেনকাইমার টুপি বা বাণ্ডিল টুপি (Sclerenchyma or bundle cap)। ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি চক্রাকারে সাজান। দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের এটাই বিশেষত্ব। ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের বাইরের অংশে পাতলা প্রাকারযুক্ত গাঢ় পদার্থপূর্ণ কলা হল ফ্লোয়েম। এই কলার মধ্য দিয়েই পাতার

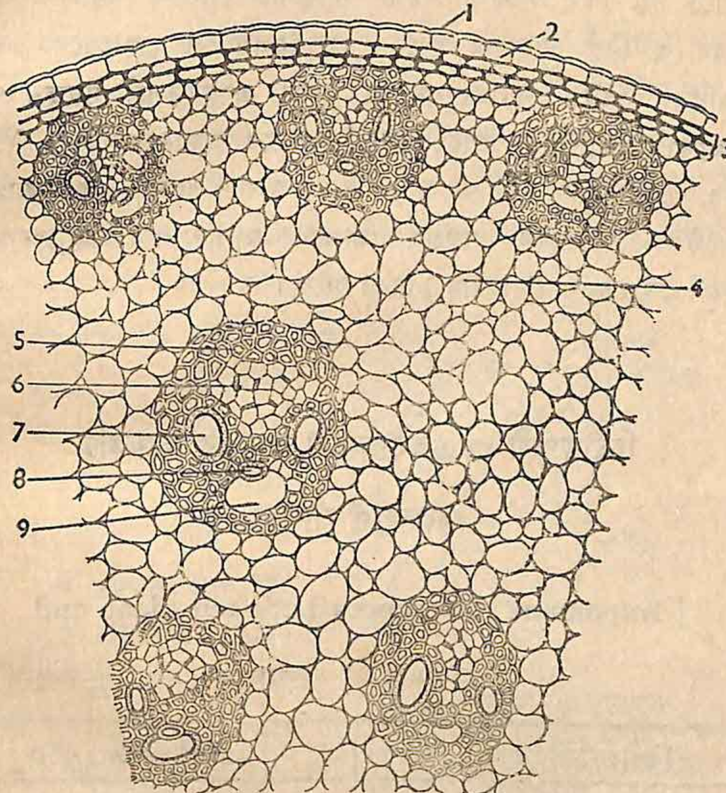
তৈরী খাদ্য দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবেশিত হয়। পুরু প্রাকারযুক্ত এবং আরও গাঢ় বর্ণের কাষ্ঠল কলাই হল জাইলেম। জাইলেম গুচ্ছগুলি পাশাপাশি অনেক সারিতে বিন্যস্ত আছে। বড়গুলি (মেটাজাইলেম) বাইরের দিকে এবং ছোটগুলি (প্রোটোজাইলেম) কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত মূল দ্বারা শোষিত রস জাইলেম কলার মধ্য দিয়ে উপরে ওঠে। জাইলেমে কাষ্ঠল অংশ থাকে এবং এই কলায় মৃত কোষের সংখ্যাই বেশী। এজন্য জাইলেম গাছকে কিছু পরিমাণে দৃঢ়তা যোগায়। এবার ফ্লোয়েম ও জাইলেমের অন্তর্বর্তী অংশটা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ কর। সেখানে রয়েছে ঘনসন্নিবিষ্ট কোষান্তর রন্ধ্রহীন কয়েক প্রস্থ কলা। এই কলা সজীব এবং এর বিভাজন ক্ষমতা প্রচুর। ফলে নতুন নতুন ফ্লোয়েম ও জাইলেম কলা জন্মায়। দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে নতুন নতুন কোষ-উৎপাদনকারী এই বিশেষ কলাকে বলে ক্যামবিয়ম (Cambium)। দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে ক্যামবিয়ম থাকা একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল দিয়ে ঘেরা কেন্দ্রীয় অংশকে বলে মজ্জা বা পিথ (Medulla or Pith)।



চিত্র নং ১৩—হাত লেন্সে ভুট্টা কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ যেমন দেখায়

একবীজপত্রী কাণ্ড (ভুট্টা): একটা কচি ভুট্টা কাণ্ড যোগাড় করে তার পাতলা প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে একই পদ্ধতিতে প্রথমে হাত লেন্স দিয়ে ও পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা কর। দেখ এটিও গোলাকার, তবে এর বাইরে থেকে কোনপ্রকার রোম জন্মায়নি। বিশেষ করে এখানে যে বৈশিষ্ট্যটি সবার আগে চোখে পড়ে তা হল গাঢ় রং-এর স্থানগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ছেদটির বাইরের স্তর ব্যারেলাকৃতি একসারি কোষস্তরে গঠিত। এটি হল বহিস্ত্বক। বহিস্ত্বকের বাইরেও যথারীতি কিউটিকল থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বহিস্ত্বক থেকে কোন রোম জন্মায় না, সেজন্য

ত্বকটি মসৃণ দেখায়। বহিস্ত্বকের নিচে দুই বা তিন সারিতে সাজান একটানা স্ক্লেরেনকাইমা স্তরটিকে অধস্ত্বক বলে। অধস্ত্বকের ভিতরে পরিধি থেকে



চিত্র নং ১৪—প্রস্থচ্ছেদে ভুট্টা কাণ্ডের একাংশ

1—কিউটিকল্, 2—বহিস্ত্বক, 3—অধস্ত্বক, 4—আদিকলা বা কর্টেক্স, 5—স্ক্লেরেনকাইমা সীদ, 6—ফ্লোয়েম, 7—মেটাজাইলেম, 8—প্রোটোজাইলেম, 9—প্রোটোজাইলেম ক্যাভিটি।

পরিধি পর্যন্ত স্থান দখল করে আছে পাতলা প্রাকার ও কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত প্যারেনকাইমা। এদের একত্রে বলে আদিকলা (Ground tissue) বা জেনারেল কর্টেক্স। আদিকলায় এলোমেলোভাবে ছড়ান গাঢ় রং-এর

বস্তুগুলিই ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল। পরিধির দিকের বাণ্ডিলগুলি যেমন আকারে ছোট তেমনি আবার সংখ্যায় বেশী। কিন্তু কেন্দ্রের দিকে ছড়ান বাণ্ডিলগুলি আকারে বড় কিন্তু সংখ্যায় কম। ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলে যথারীতি উপরে ফ্লোয়েম ও নিচে জাইলেম আছে। জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে ক্যামবিয়ম নেই। ক্যামবিয়ম না থাকা একবীজপত্রী গাছের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জাইলেম 'Y' আকারে সাজান থাকে। 'Y'-এর নিচের দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি বড় জলপূর্ণ গহ্বর (প্রোটোজাইলেম ক্যাভিটি)। প্রত্যেকটি বাণ্ডিল আলাদা আলাদাভাবে স্ক্লেরেনকাইমা কলায় (স্ক্লেরেনকাইমা সীদ) ঢাকা থাকে।

দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী কাণ্ডের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য

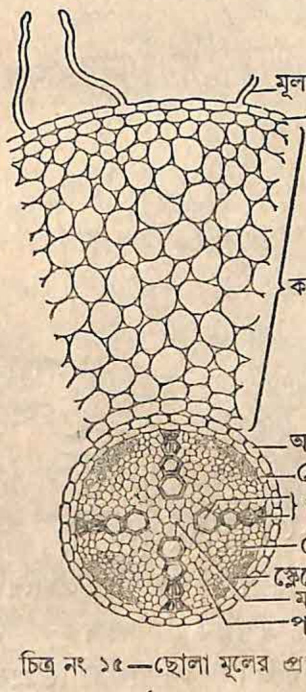
[Important differences between dicot and monocot stem]

দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড	একবীজপত্রী কাণ্ড
১. বহিস্ত্বকে রোম থাকে।	১. বহিস্ত্বকে রোম থাকে না।
২. অন্তস্ত্বক আছে।	২. অন্তস্ত্বক নেই।
৩. ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল চক্রাকারে বিন্যস্ত থাকে।	৩. ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল এলোমেলো-ভাবে ছড়ান থাকে।
৪. জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে ক্যামবিয়ম থাকে।	৪. ক্যামবিয়ম থাকে না।

মূলের অভ্যন্তরীণ গঠন
[Internal structure of Root]

দ্বিবীজপত্রী মূল (ছোলা) : কচি ছোলা মূলের একটি সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ নাও। প্রস্থচ্ছেদটি সেফ্রানিন (Sefranin) রং-এ ডুবিয়ে স্লাইডে রাখ ও একটি কভার গ্লাস চাপা দাও। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এবার পরীক্ষা কর।

লক্ষ্য কর মূলটি গোলাকার। বাইরের স্তরটি এক সারিতে সাজান পাতলা প্যারেনকাইমা দিয়ে গঠিত। এটাই হল এপিব্লেমা (Epiblema) বা বহিস্ত্বক। বহিস্ত্বকের কতকগুলি কোষ লম্বা হয়ে মূলরোম গঠন করেছে। মূলরোম এককোষী (unicellular)। বহিস্ত্বকের ভিতরের কোষগুলি বৃহদাকার প্যারেনকাইমা দিয়ে তৈরী। এই কোষেরগুলি মাঝে মাঝে আছে কোষান্তর রন্ধ্র। এই কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত বিস্তৃত অংশকেই বলে কর্টেক্স। কর্টেক্সের ভিতরের স্তরটি একসারিতে সাজান ব্যারেলাকৃতি কোষ দিয়ে তৈরী। এই স্তরটি অন্তস্ত্বক। অন্তস্ত্বক প্রকৃতপক্ষে কর্টেক্সেরই

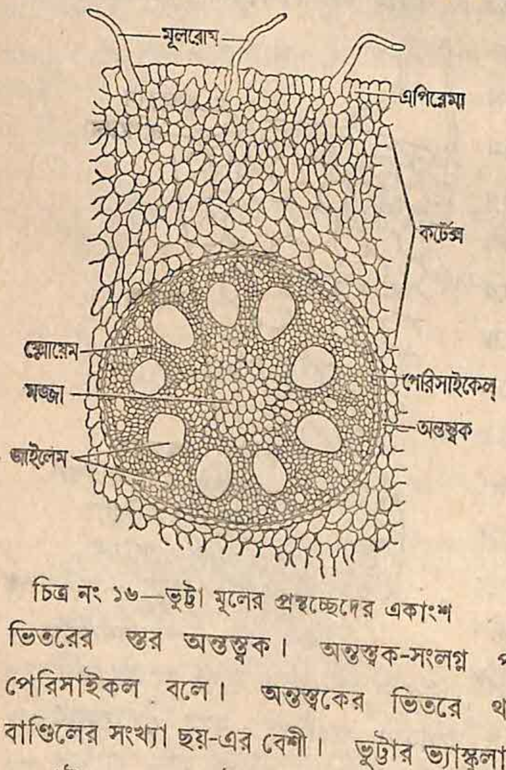


চিত্র নং ১৫—ছোলা মূলের প্রস্থচ্ছেদের একাংশ

অংশ, অন্তস্ত্বকের নিচে প্যারেনকাইমা স্তরটিকে বলে পেরিসাইকল (Pericycle)। অন্তস্ত্বক দিয়ে ঘেরা অঞ্চলে দেখ লাল গাঢ় রং-এর চার গুচ্ছ কলা রয়েছে। এগুলি হল জাইলেম। তবে দুই জাইলেম গুচ্ছের মাঝে থাকে ফ্লোয়েম। ফ্লোয়েমের রং অপেক্ষাকৃত ফিকে। মূলের দ্বারা শোষিত রস যথারীতি জাইলেম দিয়ে উপরে ওঠে। পাতার তৈরী খাদ্য বা সঞ্চিত খাদ্য ফ্লোয়েমের ভিতর দিয়ে অন্যত্র চলাচল করে। প্রতি ফ্লোয়েমের

উপরে আছে স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুগুচ্ছ। জাইলেম ও স্ক্লেরেনকাইমা প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা যোগায়। জাইলেম ও ফ্লোয়েম মিলে এখানেও ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল গঠিত হয়। ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের সংখ্যা চার। মূলের কেন্দ্রস্থলে আছে পাতলা প্রাকারযুক্ত প্যারেনকাইমা। এই অংশটাই মজ্জা।

একবীজপত্রী মূল (ভুট্টা): একই পদ্ধতিতে কচি ভুট্টা মূলের একটি প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করলে দেখবে যে এই মূলের বাইরেটা এক সারিতে বিন্যস্ত প্যারেনকাইমা দিয়ে তৈরী। এই স্তরকে বলে **এপিব্লেমা বা বহিস্ত্বক**। এখানেও বহিস্ত্বক থেকে বেরিয়েছে কতকগুলো এককোষী মূলরোম। বহিস্ত্বকের নিচের অংশ **কর্টেক্স**। কর্টেক্স দ্বিবীজপত্রী মূলের চেয়ে বেশী স্থান দখল করে থাকে। কর্টেক্স পাতলা প্রাকারযুক্ত প্যারেনকাইমায় তৈরী। প্যারেনকাইমাগুলির মাঝে বহু কোষান্তর রন্ধ্র বর্তমান। দ্বিবীজপত্রী মূলের মতই কর্টেক্সের একেবারে ভিতরের স্তর অন্তস্ত্বক। অন্তস্ত্বক-সংলগ্ন প্যারেনকাইমা কোষস্তরটিকে পেরিসাইকল বলে। অন্তস্ত্বকের ভিতরে থাকে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল। বাণ্ডিলের সংখ্যা ছয়-এর বেশী। ভুট্টার ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল যথারীতি ফ্লোয়েম ও জাইলেম দ্বারা গঠিত। এগুলি আলাদা আলাদা গুচ্ছে পাশাপাশি বিন্যস্ত থাকে। জাইলেম প্রায় গোলাকার এবং বড়। কেন্দ্র প্যারেনকাইমা দিয়ে তৈরী। এই অংশটিই মজ্জা। একবীজপত্রী মূলের মজ্জা দ্বিবীজপত্রী মূল অপেক্ষা বড়।



চিত্র নং ১৬—ভুট্টা মূলের প্রস্থচ্ছেদের একাংশ

দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী মূলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রভেদ

[Important differences between a dicot root and a monocot root]

দ্বিবীজপত্রী মূল	একবীজপত্রী মূল
১. কর্টেক্স ছোট।	১. কর্টেক্স বড়।
২. ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের সংখ্যা চার থেকে ছয়।	২. ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের সংখ্যা ছয়-এর বেশী।
৩. মজ্জা ছোট।	৩. মজ্জা বড়।

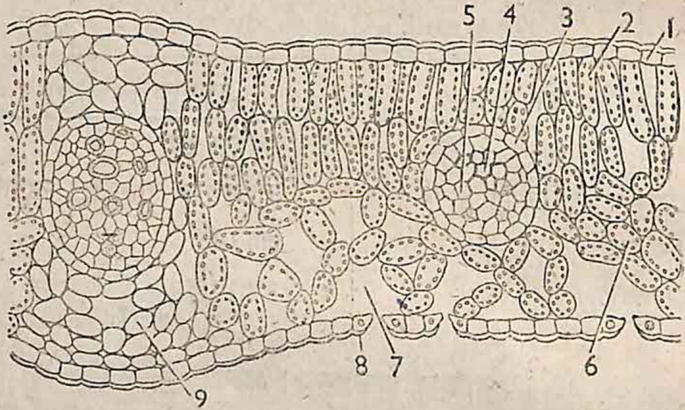
পাতার অভ্যন্তরীণ গঠন

[Internal structure of a Leaf]

দ্বিবীজপত্রী একটা গাছের পাতা (ধর, আমপাতা) নিয়ে তাকে কয়েক টুকরোয় ভাগ কর। একটা আলুতে ব্লেড চালিয়ে দু' ফাঁক কর। তাতে পাতার একটা টুকরো ঢুকিয়ে দাও। নরম পাতা হাতে ধরে রেখে তার ছেদ নেওয়া সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থা। অনেকগুলো প্রস্থচ্ছেদ থেকে সবচেয়ে পাতলা একটা ছেদ নিয়ে স্লাইডে রাখ এবং তাতে একটা কভার গ্লাস চাপা দাও। এবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পাতাটি পরীক্ষা কর।

ছবিতে দেখ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পাতাটি কেমন দেখায়। লক্ষ্য কর, কাণ্ড বা মূলের মত পাতাও বিভিন্ন রকমের কলা দিয়ে তৈরী। এদিকে পাতার উপরে ও নিচে দু'টি একই রকমের পিপাকৃতি প্যারেনকাইমার স্তর রয়েছে। দুটো স্তরের উপরেই কিউটিকলের আবরণ রয়েছে। উপরের স্তরটিকে বলে **উর্ধ্ববহিস্ত্বক** (Upper epidermis) এবং নিচেরটিকে বলে **নিম্নবহিস্ত্বক** (Lower epidermis)। নিম্নবহিস্ত্বক উর্ধ্ব স্ত্বকের মত একটানা নয়। তার মাঝে মাঝে ফাঁকা স্থান আছে। ঐ স্থানগুলো **পত্ররন্ধ্র** (Stomata)। পত্ররন্ধ্র-সংলগ্ন গহ্বরটিকে **শ্বাসগহ্বর** (Respira-

tory cavity) বলে। দুই বহিস্ত্বকের মধ্যের অংশ যে কোষগুলো দিয়ে তৈরী তাদের বলে **মেসোফিল** কলা (Mesophyll tissue)। মেসোফিল আদি কলা। দ্বিবীজপত্রী পাতায় মেসোফিল দু'রকম। উর্ধ্বস্ত্বকের সঙ্গে



চিত্র নং ১৭—দ্বিবীজপত্রী পাতার অন্তর্গঠন :
1—উর্ধ্ববহিস্ত্বক ; 2—প্যালিসেড প্যা রনকাইমা ; 3—বাণ্ডিল আচ্ছাদন ; 4—জাইলেম ; 5—ফ্লোয়েম ; 6—স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা ; 7—শ্বাসগহ্বর ; 8—নিম্নবহিস্ত্বক ও কিউটিকল্ ; 9—প্যারেনকাইমা।

লম্বভাবে থামের মত সাজান স্তরকে বলে **প্যালিসেড প্যারেনকাইমা** (Palisade parenchyma)। তার নিচে থেকে নিম্নবহিস্ত্বক পর্যন্ত বিস্তৃত প্যারেনকাইমাকে বলে **স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা** (Spongy parenchyma)। স্পঞ্জি প্যারেনকাইমার কোষগুলি ডিম্বাকার বা গোলাকার। প্যালিসেড প্যারেনকাইমায় তুলনামূলকভাবে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। প্রস্থচ্ছেদে পাতার কেন্দ্রের বড় ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলটি মধ্যশিরাকে নির্দেশ করে। এ ছাড়া শিরা-উপশিরার সংখ্যা অনুসারে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের সংখ্যার তারতম্য ঘটে। প্রত্যেক বাণ্ডিলকে ঘিরে এক স্তরের একটি প্যারেনকাইমা আচ্ছাদন আছে। একে **বাণ্ডিল আচ্ছাদন** (Bundle sheath) বলে। পাতায় জাইলেম উপরের দিকে আর ফ্লোয়েম নিচের দিকে থাকে। জাইলেম ও ফ্লোয়েম পরস্পর-সংলগ্ন ; মধ্যে কোন ক্যামবিয়ম নেই। বড় ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের উপরে ও নিচে ত্বক পর্যন্ত বিস্তৃত প্যারেনকাইমা আছে।

৩ প্রাণিদেহের কলা ও অঙ্গ
[Animal tissue and organ]

জীবদেহের কোষ সম্বন্ধে আগেই তোমাদের মোটামুটি জ্ঞান হয়েছে। পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ভিদদেহের কলা সম্বন্ধেও সাধারণ ধারণা লাভ করেছো। এবার প্রাণিদেহের কলা ও বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক্।

একইভাবে সৃষ্ট, একইভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, একই কাজে নিযুক্ত এবং একই আকৃতিবিশিষ্ট কোষগুলি দলবদ্ধভাবে বা স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে যখন সুষ্ঠুভাবে কোন কাজ সম্পাদন করে তখন ওই দলবদ্ধ কোষগুলিকে টিস্যু বা কলা বলা হয়।

বহুকোষী প্রাণীর কোষগুলি প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্তঃ দেহকোষ বা সোমাটিক সেল (Body cell or Somatic cell) এবং জনন কোষ বা জার্মসেল (Reproductive cell or germ cell)। দেহকোষ দিয়ে গঠিত কলাকে বলা হয় দেহকলা বা সোমাটিক টিস্যু। প্রধান চারপ্রকার দেহকলা ও তাদের কাজের বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল।

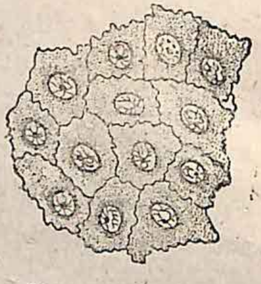
১. আবরণী কলা বা এপিথেলিয়াল টিস্যু
[Epithelial tissue]

দেহের বাইরে ও ভিতরে পাতলা পর্দার মত যে কলা দেহকে আবৃত রাখে তাকেই বলে আবরণী কলা। দেহের বাইরের ত্বক, পাকনালীর ভিতরের পর্দা প্রভৃতি আবরণী কলার উদাহরণ। আবরণী কলার কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, পরস্পর সংযোজক পদার্থ দিয়ে যুক্ত এবং যোজক কলা নির্মিত বেসমেণ্ট মেমব্রেনের উপর অবস্থিত। এই কলার কোষগুলি যদি একটি স্তরে সজ্জিত থাকে তবে তাকে সরল আবরণী কলা বলে। কিন্তু একাধিক স্তরে সজ্জিত আবরণী কলাকে স্তরীভূত বা যৌগিক আবরণী কলা বলা হয়।

বিভিন্ন স্তরের আবরণী কলা বিভিন্ন আকৃতির কোষ দিয়ে গড়া। কোষের আকৃতি অনুযায়ী আবরণী কলা নিম্নরূপঃ

(ক) স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ম (Squamous epithelium)

এই আবরণী কলার কোষগুলি পাত্‌লা, চ্যাপ্টা এবং ঘরের মেঝের টালির মত পরস্পর যুক্ত। মেরুদণ্ডীর দেহগহ্বরকে পেরিটোনিয়ম নামে যে পর্দা ঢেকে রাখে তা হল সরল স্কোয়ামাস কলা। ঐ এপিথেলিয়মকে এণ্ডোথেলিয়ম বলে। কিন্তু মানবদেহের বাইরের ত্বকে, মুখগহ্বর ও নাসাবিবরের আবরণীতে স্তরীভূত স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ম আছে।



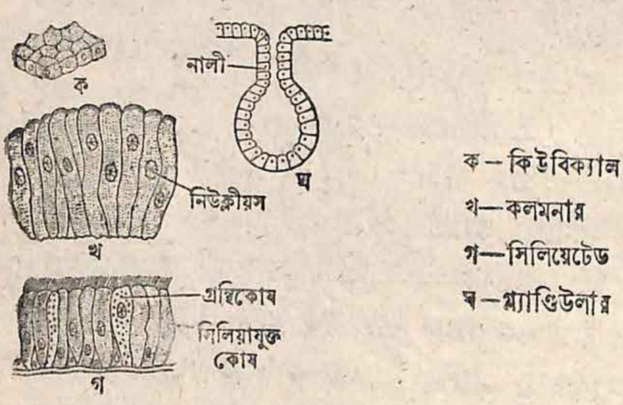
চিত্র নং ১৮—স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ম

(খ) কিউবিক্যাল এপিথেলিয়ম (Cubical epithelium)

এই কলার কোষগুলি ঘনক (cube) আকৃতিবিশিষ্ট। উপর থেকে কোষগুলিকে বহুভূজের মত দেখায়। লালাগ্রন্থি, বৃক্কনালিকা ও থাইরয়েড গ্রন্থির আবরণীতে এরূপ কলা আছে।

(গ) কলমনার এপিথেলিয়ম (Columnar epithelium)

এই কলায় কোষগুলি লম্বাটে, স্তম্ভাকার। এগুলি পাশাপাশি সজ্জিত



চিত্র নং ১৯—বিভিন্ন প্রকার এপিথেলিয়ম

থাকে। কলমনার কলার কোষের নিউক্লীয়স বেশ বড়। মেরুদণ্ডীর পাকস্থলী ও অন্ত্রের ভিতরের স্তর এই কলায় গঠিত।

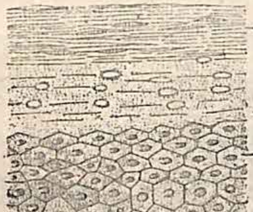
(ঘ) সিলিয়েটেড এপিথেলিয়ম (Ciliated epithelium)

এই কলাতে কিউবিক্যাল বা কলমনার কোষ থাকে। তবে কোষগুলির মুক্তধারে থাকে অসংখ্য ছোট ছোট সিলিয়া। সিলিয়া থাকে বলেই এই কলাকে সিলিয়েটেড এপিথেলিয়ম বলে। কেঁচো ও অন্য প্রাণীর শুক্রনালীতে সিলিয়েটেড কিউবিক্যাল এপিথেলিয়ম আছে; আর কেঁচোর অন্ত্রের ও স্থলজ মেরুদণ্ডীর শ্বাসনালী প্রভৃতি স্থানে সিলিয়েটেড কলমনার এপিথেলিয়ম কলা আছে।

দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আবরণী কলার কাজও ভিন্ন। কাজের উপর ভিত্তি করে আবরণী কলাকে নিম্নরূপ তিনভাগে ভাগ করা হয়:

(অ) প্রোটেকটিভ বা রক্ষাকারী আবরণী কলা (Protective epithelium)

এই কলা প্রাণীর দেহকে বাইরের আঘাত ও রোগ সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। অধিকাংশ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের আবরণী কলা একটিমাত্র কোষস্তরে গঠিত। কিন্তু স্থলজ মেরুদণ্ডীর দেহের আবরণী যৌগিক, অর্থাৎ কোষগুলি একাধিক স্তরে সজ্জিত। আমাদের দেহের বহিস্ত্বকই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিশেষ ধরনের আবরণী কলার কোষ থেকেই নখ, নখর, চুল এবং পালকের সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্র নং ২০—একাধিক স্তরে সজ্জিত কলা

(আ) গ্ল্যাণ্ডিউলার বা গ্রন্থিময় আবরণী কলা (Glandular epithelium)

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রস সৃষ্টিকারক গ্রন্থিতে এই ধরনের আবরণী কলা থাকে। রস নিঃসারণ করাই এই কলার কোষগুলির বৈশিষ্ট্য

তবে কোষগুলি কিউবিক্যাল ও কলমনার কোষেরই পরিবর্তিত রূপ। ঐ কলার কোষগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে গহ্বর সৃষ্টি করে। এই ধরনের কোষগুলিকে গবলেট কোষ (Goblet cell) বলে। মানুষ ও অন্য অনেক মেরুদণ্ডীর বহুকোষী লালাগ্রন্থিতে এই ধরনের আবরণী কলা আছে। এই আবরণী কলা নিঃসৃত রস আঠালো বা জলীয়।

(ই) সেনসরী বা সংজ্ঞাবহ আবরণী কলা
(Sensory epithelium)

এই কলার কোষগুলিও কলমনার। কিন্তু প্রতি কোষের মুক্ত প্রান্তে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সংজ্ঞাবহ রোম বা সিলিয়া থাকে। সংজ্ঞাবহ নার্ভের সঙ্গে যুক্ত



চিত্র নং ২১—একটি স্বাদকোরক



চিত্র নং ২২—ঘ্রাণের অনুভূতি গ্রাহকঅঙ্গ

থাকায় এই কোষ স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ প্রভৃতি অনুভূতি গ্রহণ করে। কেঁচোর বহিস্ত্বকে এবং আমাদের জিবে ও নাসাপথে এই ধরনের কলা আছে।

২. যোগকলা বা কানেকটিভ টিস্যু
[Connective tissue]

দেহের বিভিন্ন কলা ও অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এই যোগকলা। তাছাড়া এই কলা দেহের ভার বহন ও ধারণের কাজও করে। এপিথেলিয়মে কোষের সংখ্যা অনেক এবং কোষান্তর পদার্থ নেই বললেই চলে। এখানে অবস্থাটা ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ, এই কলার কোষের সংখ্যা কম, কিন্তু কোষান্তর পদার্থ প্রচুর। কোষান্তর পদার্থের উপর ভিত্তি করে যোগকলাকে তিনভাগে ভাগ করা চলে।



চিত্র নং ২৩—যোগকলা

(ক) প্রকৃত যোগকলা ঃ এরিওলার কলা বা তন্তুময় কলা প্রকৃত যোগকলা। দেহের ভিতর দেহত্বকের নিচে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যবর্তী স্থান দখল করে থাকে এরিওলার কলা। জেলীর মত পদার্থে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কোষ নিয়ে এই কলা গঠিত। এই জেলীর মত পদার্থে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু জালের আকারে ছড়িয়ে আছে। তন্তুজালের মধ্যেই কোষগুলি আবদ্ধ থাকে। কোষগুলি দু'রকমের ঃ কিছু কোষ সৃষ্টি করে তন্তু; অন্যগুলি সৃষ্টি করে জেলীর মত পদার্থ। তন্তুগুলিও আবার দু'ধরনের। ফিকে রং-এর ঢেউ খেলানো তন্তুগুলোকে বলে শ্বেততন্তু (White fibre)। শ্বেততন্তু সাধারণতঃ গুচ্ছাকারে থাকে। গুচ্ছের মধ্যেও তন্তুগুলি পৃথক পৃথকভাবে ছড়ান থাকে; তারা স্থূল এমনকি শাখা-প্রশাখায়ও বিভক্ত নয়। অন্য তন্তুগুলি পীতবর্ণের (Yellow fibre)। এগুলি সূক্ষ্ম ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। শাখাগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে জালের সৃষ্টি করে। এদের ইলাসটিক তন্তু (Elastic fibre) ও বলে।

বন্ধনী বা লিগামেণ্ট (Ligament) এবং কণ্ডরা বা টেনডন (Tendon) তন্তুময় কলা দিয়েই গঠিত। এই বন্ধনী এবং কণ্ডরা দেহ-কাঠামোর সংযোজক বা ধারক।

এরিওলার কলার পরিবর্তিত রূপ হল মেদকলা বা অ্যাডিপোজ কলা (Adipose tissue)। এই কলার কোষগুলি বেশ বড় এবং কোষের মধ্যে প্রচুর চর্বি কণা জমা থাকে। পিঠ, বুক, ঘাড়, পেট প্রভৃতি স্থানেই এই কলা বেশী পরিমাণে আছে।

(খ) কঙ্কাল কলা বা স্কেলিটাল টিস্যু (Skeletal tissue): মেরুদণ্ডীর অন্তঃকঙ্কালে, অর্থাৎ দেহের কাঠামোতে এই কলা থাকে। কোমলাস্থি বা কার্টিলেজ (Cartilage) এবং অস্থি বা হাড় (bone) দিয়েই এই কলা গঠিত।

(i) কার্টিলেজ: এই কলা অপেক্ষাকৃত শক্ত হলেও নমনীয় এবং স্থিতিস্থাপক, তাই চাপ বা আঘাতে ভাঙে না। মানুষের বহিঃকর্ণ (পিনা) কার্টিলেজে তৈরী। সেজন্য গুরুজনের কানমলা খেলেও তোমাদের কান অক্ষত থাকে। এই কলার কোষগুলি সংখ্যায় দুই, চার, আট এইভাবে একসঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছভাবে বিশেষ অর্ধস্বচ্ছ একপ্রকার জৈব পদার্থের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। ঐ বিশেষ পদার্থের নাম কন্‌ড্রিন (Chondrin)। কোষগুলিই কন্‌ড্রিন সৃষ্টি করে। কন্‌ড্রিনের মধ্যে যে সব শূন্য গহ্বর দেখা যায় তাদের বলে ল্যাকিউনি (Lacunae)*।



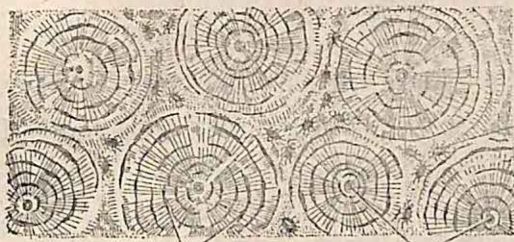
চিত্র নং ২৪—কার্টিলেজের প্রস্থচ্ছেদ.

কন্‌ড্রিনের আকৃতি ও গঠনগত প্রকারভেদে কার্টিলেজ নানা ধরনের হয়। সমস্ত কার্টিলেজকে ঘিরে একটা পাতলা তন্তুময় সাদা ঝিল্লি থাকে। হাঙরজাতীয় মাছের অন্তঃকঙ্কাল এই কলায় গঠিত।

(ii) অস্থি: অস্থিময় মাছ ও স্থলচর মেরুদণ্ডীর অন্তঃকঙ্কাল এই যোগকলা দিয়ে গঠিত। কার্টিলেজের মত এই কলার কোষগুলিও বিশেষ এক পদার্থের মধ্যে ডুবে থাকে। তবে ঐ জৈব পদার্থ প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ফসফেট দ্বারা গঠিত হওয়ায় বেশ শক্ত। তাই অস্থি যথেষ্ট আঘাত

* একবচনে—ল্যাকিউনা।

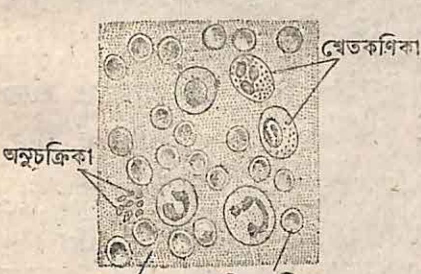
বা চাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। তবে এর স্থিতিস্থাপকতা নেই। চাপে একবার বেঁকে গেলে স্বস্থানে ফিরে যেতে পারে না। বিক্ষিপ্ত অস্থিকোষগুলি ল্যাকিউনির মধ্যে সুসজ্জিত থাকে। অস্থিকলার কেন্দ্রস্থলে



চিত্র নং ২৫—অস্থির প্রস্থচ্ছেদের একাংশ

বড় গহ্বর অস্থিমজ্জায় (Marrow) পূর্ণ। অস্থিমজ্জার সঙ্গে সংযুক্ত সরু সরু নালীগুলিকে হ্যাভারসিয়ান নালী (Haversian canal) বলে। অস্থি কোষগুলিও সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। পেরিটোনিয়ম তন্তু দিয়ে গঠিত পাতলা একটি আবরণে সমগ্র অস্থি আবৃত থাকে। কঠিন অস্থিই দেহের ভার বহন করে।

(গ) সংবহন কলা বা ভ্যাসকুলার টিস্যু (Vascular tissue) ঃ রক্ত ও লসিকা সংবহন কলার উদাহরণ। এই তরল কলা বিশেষ বিশেষ নালীপথে দেহের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চলাচল করে। রক্তের জলীয় অংশকে রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma) বলে। জল, লবণ ও প্রোটীন দিয়ে রক্তরস গঠিত। মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তরসে ভেসে বেড়ায় লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা নামে তিন রকমের রক্ত কণিকা বা কোষ। কিন্তু লসিকায় প্রধানতঃ রক্তরসই আছে, কোন কণিকা নেই। তবে রক্তের রক্তরসে যে পরিমাণ প্রোটীন থাকে লসিকার রক্তরসে তা থাকে না।



চিত্র নং ২৬—মেরুদণ্ডীর রক্তের গঠন

মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত কণিকা

(i) লোহিত রক্ত কণিকা (Red blood corpuscles) :

রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা সর্বাধিক। মানুষের লোহিত রক্ত কণিকা নিউক্লীয়সবিহীন এবং এর আকৃতি গোলাকার অবতল লেন্সের মত। কিন্তু অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত রক্ত কণিকা উভোত্তল (biconvex) এবং নিউক্লীয়সযুক্ত। এই কণিকায় **হিমোগ্লোবিন** (Haemoglobin) নামে একপ্রকার লৌহগঠিত প্রোটীন থাকে। হিমোগ্লোবিন সহজেই অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে অক্সি-হিমোগ্লোবিনে পরিণত হয়। অক্সি-হিমোগ্লোবিনের রং লাল। তাই মেরুদণ্ডীর রক্ত লাল দেখায়।*

পরিণত অবস্থায় মানুষের দেহে অস্থির লোহিত মজ্জা থেকে লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। পুরানো কণিকাগুলো প্রধানতঃ প্লীহাতেই ধ্বংস হয়। প্রতি মুহূর্তে ১০০ লক্ষ লোহিত কণিকার সৃষ্টি ও ধ্বংস চলে।

লোহিত কণিকার প্রধান কাজ হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করে বিভিন্ন কোষে পরিবেশন করা আর সেখান থেকে দেহের ক্ষতিকর কার্বন ডায়ক্সাইড সরিয়ে আনা।

(ii) শ্বেত রক্ত কণিকা (White blood corpuscles) :

রক্তে লোহিত কণিকার তুলনায় শ্বেত কণিকা অনেক কম। তবে শ্বেত কণিকার আকার লোহিত কণিকার থেকে বড়। শ্বেত কণিকার আকৃতি ও গঠন পরিবর্তনশীল। শ্বেত কণিকা বর্ণহীন, স্বচ্ছ। প্রতিটি শ্বেত কণিকায় একটি করে নিউক্লীয়স থাকে। নিউক্লীয়সের আকার অনুসারে শ্বেত কণিকা বিভিন্ন প্রকারের। সৃষ্টি, আকৃতি ও কাজের দিক দিয়ে মানুষের রক্তে শ্বেত কণিকা প্রধানতঃ তিন প্রকার। যে সব শ্বেত কণিকায় নিউক্লীয়স কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত কিন্তু খণ্ডগুলি যুক্ত তাদের বলে **গ্রানুলোসাইটস্**। এগুলি অস্থির মজ্জার বাইরের জালক থেকে সৃষ্ট। বৃহৎ গোলাকার

---

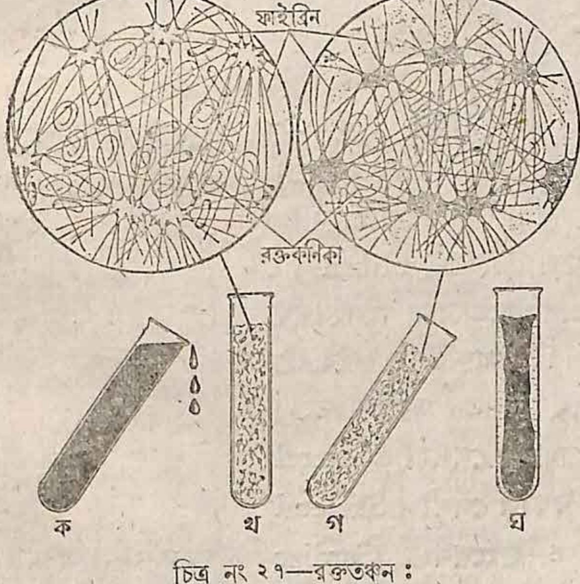
*কেঁচোর রক্তরসে লোহিত রক্ত কণিকা নেই। কিন্তু এই রক্তরসে **হিমোগ্লোবিন** দ্রবীভূত থাকে। তাই কেঁচোর রক্তও লাল। আবার চিংড়ির রক্তরসে হিমোগ্লোবিনের পরিবর্তে **হিমোসায়ানিন** দ্রবীভূত থাকায় চিংড়ির রক্ত বর্ণহীন।

নিউক্লীয়স যুক্ত শ্বেত কণিকাকে বলে **লিম্ফোসাইট**। লসিকাগ্রন্থি ও প্লীহা থেকে লিম্ফোসাইট জন্মায়। প্লীহা ও অস্থির মজ্জা থেকে সৃষ্ট শ্বেত কণিকাকে বলে **মনোসাইট**। মনোসাইটেও বৃহৎ গোলাকার নিউক্লীয়স থাকে।

শ্বেত কণিকা হ'ল দেহরক্ষী। বাইরে থেকে কোন অনিষ্টকারী জীবাণু রক্তে প্রবেশ করলে গ্রানুলোসাইটস্ ও মনোসাইটস্ তাকে ঘিরে ফেলে ধ্বংসের কাজে লেগে যায়। সফল হলে দেহে রোগ হয় না। সফল না হলেই যত ঝঞ্ঝাট। নানা রোগ দেখা দেয়। দেহে ব্যাক্‌টিরিয়া প্রবেশ করলে মনোসাইটস্ ক্ষণপদ বের করে তাকে আত্মসাৎ করে এবং দেহকে ব্যাক্‌টিরিয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে।

(iii) অণুচক্রিকা (Platelet):

রক্তের অত্যাবশ্যক উপাদান হল অণুচক্রিকা। লোহিত রক্ত কণিকার



চিত্র নং ২৭—রক্ততঞ্চন :
ক—সদ্য সংগৃহীত রক্ত, খ ও গ – রক্ততঞ্চনের পর্যায় ক্রমিক দশা, ঘ – তঞ্চিত রক্ত।

থেকে আকারে এরা ছোট। মানুষের অণুচক্রিকার আকার থালার মত। এতে নিউক্লীয়স থাকে না। কোন স্থান কেটে রক্ত পড়তে থাকলে সেই

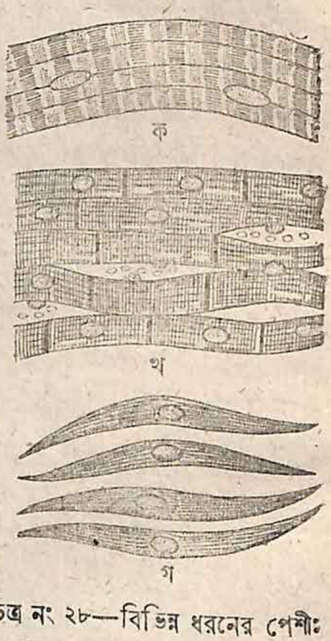
রক্তপাত বন্ধ করতে সাহায্য করা অণুচক্রিকার প্রধান কাজ। এই প্রক্রিয়াকে রক্ততঞ্চন বলে।

কিভাবে অণুচক্রিকার সাহায্যে ক্ষতস্থানের চারদিকে জালের (ফাইব্রিনের) সৃষ্টি হয় এবং রক্তপড়া বন্ধ হয় সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে পরে শিখবে। ২৭ নং ছবিতে রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া লক্ষ্য কর।

৩. পেশীকলা বা মাস্‌কুলার টিস্যু

[Muscular tissue]

পেশীকলার কোষগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সঙ্কোচনশীলতা। তাই বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ও গমনাগমনের মূলে রয়েছে এই পেশীর ক্রিয়াকলাপ। পেশীকলার কোষগুলি লম্বাটে। এই কোষগুলি পেশীতন্তু নামে পরিচিত। পেশীতন্তুর ভিতরে জেলীর মত প্রোটোপ্লাজমকে সারকোপ্লাজম (Sarcoplasm) বলে। সারকোপ্লাজমের মধ্যে আছে লম্বালম্বিভাবে বড় সঙ্কোচনশীল মায়োফাইব্রিল (Myofibril)। মায়োফাইব্রিলের সঙ্কোচনের ফলেই পেশী সঙ্কুচিত হয়। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে পেশীকলা তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—আন্তরযন্ত্রীয় পেশী (Visceral muscle), কঙ্কাল পেশী (Skeletal muscle) ও হৃৎপেশী (Cardiac muscle)।



চিত্র নং ২৮—বিভিন্ন ধরনের পেশীঃ ক—সরেখ পেশী, খ–হৃৎপেশী, গ—অরেখ পেশী।

(ক) **আন্তরযন্ত্রীয় পেশীঃ** এই পেশী ঐচ্ছিক নার্ভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এদের ক্রিয়াকলাপ প্রধানতঃ স্বতঃক্রিয়। তাই এই পেশীকে

অনৈচ্ছিক পেশী (Involuntary muscle) বলে। পাকনালী এবং দেহের যে যে অংশ ঐচ্ছিক নার্ভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় সেই সব স্থানে এই কলা আছে। এই কলার কোষগুলির আকৃতি টাকুর মত (Spindle-shaped)। কোষের কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লীয়স চেপ্টাকৃতি। মায়োফাইব্রিলগুলি কোষের মধ্যে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত থাকে। এই পেশীর তন্তুতে আড়াআড়িভাবে সাদা ও কালো দাগ না থাকায় এদের **অরেখ পেশী** বলে। আন্তরযন্ত্রীয় পেশী ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় এবং তার ফলেই এর কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে চলে।

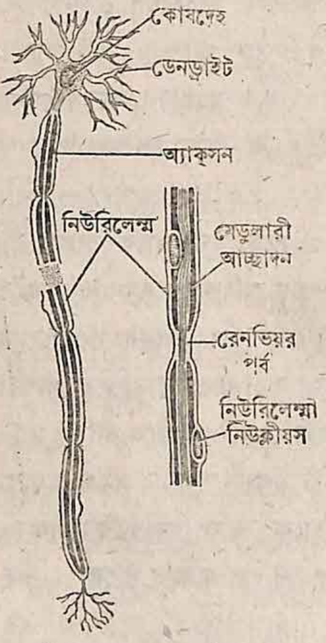
(খ) **কঙ্কাল পেশী ঃ** দেহের কঙ্কালের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলেই এর নাম হয়েছে **কঙ্কাল পেশী**। কঙ্কাল পেশী দেহের অধিকাংশ স্থান দখল করে থাকে। এই পেশী **ঐচ্ছিক** (Voluntary)। অর্থাৎ এদের সঙ্কোচনের দ্বারাই বিশেষ বিশেষ অঙ্গকে ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করা এবং স্থানান্তরে যাওয়া আসা সম্ভব হয়। পেশীর কোষগুলি নির্দিষ্ট **সেল মেমব্রেন** দিয়ে সীমিত নয়। অনেকগুলি কোষ মিলে গড়ে উঠেছে একটি কঙ্কাল তন্তু। সমগ্র তন্তুকে ঘিরে যে ঝিল্লি বা মেমব্রেন থাকে তাকে বলে **সারকোলেম্মা**। সারকোলেম্মার নিচেই কোষগুলির নিউক্লীয়স পর পর সজ্জিত থাকে। এই ধরনের তন্তুগুলিকে **সিন্‌সিটিয়ম্‌** (Syncytium) বলে। তাছাড়া এই তন্তুগুলিতে আড়াআড়িভাবে সাদা ও কালো দাগ থাকে। তাই এই তন্তু দিয়ে গঠিত পেশীকে **সরেখ** (striated) পেশী বলে। কঙ্কাল পেশী বেশ জোরের সঙ্গে হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়, ফলে দেহ নাড়াচাড়া করা সম্ভব হয়। যৎসামান্য বিরতি দিয়ে এই পেশী অবিরত সঙ্কুচিত হতে পারে।

(গ) **হৃৎপেশী ঃ** কেবল মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে এ ধরনের পেশী থাকে। কঙ্কাল পেশীর মত এই পেশীর তন্তুও সরেখ। তবে এই তন্তুর নিউক্লীয়সগুলি কঙ্কাল পেশীর নিউক্লীয়সের মত পরিধিতে অবস্থিত নয়, পরিধি থেকে নিচে তন্তুর মধ্যেই অবস্থিত। তাছাড়া এই পেশীর তন্তুগুলি পরস্পর সংযুক্ত এবং তারা স্বাধীনভাবেই সঙ্কুচিত হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া এই পেশীর উপর নির্ভরশীল।

৪. নার্ভকলা বা নার্ভ টিস্যু

[Nervous tissue]

নার্ভতন্ত্র আছে এমন সব প্রাণীর মস্তিষ্ক ও নার্ভসূত্র নার্ভ কলা দিয়ে গঠিত। বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই কলার কোষকে নিউরন (Neurone) বা নার্ভকোষ বলে। নার্ভকোষের প্রধান অংশ কোষদেহ (Cell body)। কোষদেহের মধ্যে আছে নিউক্লীয়স। নিউক্লীয়সকে ঘিরে থাকে সাইটোপ্লাজম। কোষদেহ থেকে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য ডেনড্রাইট (Dendrite) ও একটি মাত্র অ্যাক্সন (Axon)। এগুলি সাইটোপ্লাজম দিয়ে গড়া প্রবর্ধন। ডেনড্রাইটগুলি ছোট ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত। অ্যাক্সনটি লম্বা এবং সাধারণতঃ এর শাখা-প্রশাখা থাকে না। তবে অনেক সময় কোষদেহ থেকে বেরিয়ে কিছু দূরে অ্যাক্সন শাখা সৃষ্টি করে। অ্যাক্সন পরিশেষে নার্ভতন্তুতে পরিণত হয়। নার্ভতন্তুর বাইরে একটা পাতলা আবরণী থাকে। এই আবরণীকে নিউরিলেম্মা (Neurilemma) বলে। কোন কোন নার্ভতন্তুর নিউরিলেম্মার ভিতরের দিকে স্নেহজাতীয় পদার্থ দিয়ে গঠিত আর একটি আচ্ছাদন থাকে। ভিতরের ঐ আচ্ছাদনকে মেডুলারী আচ্ছাদন (Medullary sheath) বলে। মেডুলারী আচ্ছাদনে ঢাকা নার্ভতন্তুকে মেডুলেটেড নার্ভতন্তু বা আবরণযুক্ত নার্ভতন্তু বলে। আবরণবিহীন নার্ভতন্তুই হল নন-মেডুলেটেড তন্তু। মেডুলেটেড তন্তুর মেডুলারী আবরণ স্থানে স্থানে ভেঙ্গে গিয়ে যে গাঁট বা পর্ব সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় রেনভিয়র পর্ব (Node of Ranvier)। তন্তুর মাঝ বরাবর প্রসারিত লম্বা অংশটিকে অক্ষতন্তু বা অ্যাক্সিস্ সিলিনডার বলে।



চিত্র নং ২৯—একটি নার্ভকোষ ও তার গঠন

কতকগুলি নার্ভতন্তু যোগকলার আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে দড়ির মত নার্ভের (Nerve) সৃষ্টি করে।

বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া এবং কোন কিছু উত্তেজনাকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিচালিত করাই নার্ভকলার কাজ।

ডেনড্রাইটগুলিই আবেগকে কোষদেহে বহন করে নিয়ে যায় আর কোষদেহ থেকে আবেগ অ্যাক্সন দিয়ে বেরিয়ে আসে। কোষদেহ নষ্ট হলে তন্তুগুলি শুকিয়ে যায়। কতকগুলি কোষদেহ দেহের স্থানে স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে কয়েকটি পিণ্ডের সৃষ্টি করে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড এ ধরনের পিণ্ডবিশেষ। দেহের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট এ ধরনের পিণ্ডকে **নার্ভ গ্যাংলিয়া** (Nerve ganglia)* বলে।

প্রাণিদেহের বিভিন্ন কলার তালিকা নিম্নরূপ :

প্রাণিদেহের কলা

- আবরণীকলা বা এপিথেলিয়াল টিস্যু
  - (আকৃতির উপর ভিত্তি করে)
    - স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ম
    - কিউবিক্যাল এপিথেলিয়ম
    - কলমনার এপিথেলিয়ম
    - সিলিয়েটেড এপিথেলিয়ম
  - (কাজের উপর ভিত্তি করে)
    - প্রোটেকটিভ বা রক্ষাকারী আবরণী কলা
    - গ্ল্যাণ্ডিউলার বা গ্রন্থিময় আবরণী কলা
    - সেনসরী বা সংজ্ঞাবহ আবরণী কলা
- যোগকলা বা কানেকটিভ টিস্যু
  - প্রকৃত যোগকলা
  - কঙ্কাল কলা বা স্কেলিটাল টিস্যু
    - কার্টিলেজ বা কোমলাস্থি
    - অস্থি বা হাড়
  - সংবহন কলা বা ভাস্কুলার টিস্যু
- পেশীকলা বা মাস্‌কুলার টিস্যু
  - আন্তরযন্ত্রীয়পেশী (অনৈচ্ছিক পেশী)
  - কঙ্কালপেশী (ঐচ্ছিক পেশী)
  - হৃৎপেশী (অনৈচ্ছিক পেশী)
- নার্ভকলা বা নার্ভ টিস্যু

*একবচনে—নার্ভ গ্যাংলিয়ন। নার্ভের সুন্দর ও সুষ্ঠু কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে আলোচিত হয়েছে

অঙ্গ বা যন্ত্র (Organ)

বিভিন্ন কলার বিষয়ে তোমরা জানলে। বিভিন্ন ধরনের কতকগুলি কলা মিলিত হয়ে দেহের নানা কাজে রত। ঐ মিলিত কলা দিয়েই গঠিত হয়েছে দেহযন্ত্র বা অঙ্গ। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেহের ক্ষুদ্রান্ত্রের কথাই ধরা যাক্। এটি একটি অঙ্গ। এর কাজ খাদ্য পরিপাক ও রস শোষণ করা। এই ক্ষুদ্রান্ত্র বিভিন্ন কলা দিয়ে গঠিত। এর বাইরের স্তরে আছে এপিথেলিয়াল টিস্যু। এপিথেলিয়াল টিস্যুর ভিতরের দিকে দু'টি মাস্‌কুলার টিস্যুর স্তর আছে, তারপরেই আছে একস্তরবিশিষ্ট যোগকলা বা কানেকটিভ টিস্যু। কানেকটিভ টিস্যুর পর যে পাতলা এপিথেলিয়াল টিস্যুর স্তর আছে সেটাই ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃস্তর। এইসব কলাগুলির মধ্যে আবার নার্ভ ও রক্তবাহ ছড়িয়ে আছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রতিটি কলা তার নির্দিষ্ট কাজে রত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এদের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল খাদ্যকে পরিপাক ও শোষণ করা। তবে আহার, পরিপাক, শোষণ ও অপাচ্য অংশ বাইরে পরিত্যাগ করার কাজ একা ক্ষুদ্রান্ত্র করতে পারে না। **মুখ, দাঁত, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, যকৃৎ, পিত্তাশয়, অগ্ন্যাশয়** প্রভৃতি অঙ্গ পাচন কাজে সাহায্য করে। এই অঙ্গগুলিই মিলিতভাবে গড়ে তোলে একটি বিশেষ তন্ত্র। সেই তন্ত্রের নাম **পাচন তন্ত্র** (Digestive system)। এরূপ বিভিন্ন তন্ত্রের মাধ্যমেই প্রাণিদেহের বিভিন্ন কার্যকলাপ চলে। তাই একথা বলা যায় যে **প্রাণিদেহ কতকগুলি তন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত।**

প্রাণিদেহের প্রধান প্রধান তন্ত্রগুলি নিচে উল্লেখ করা হ'ল :

(ক) **ত্বকীয়তন্ত্র** (Integumentary system) : **দেহ চর্ম** এবং চর্ম থেকে নির্গত **কেশ, নখ, আঁশ, পালক** প্রভৃতি এই তন্ত্রের অন্তর্গত। দেহকে রক্ষা করাই এই তন্ত্রের প্রধান কাজ। তথাপি বহু প্রাণীর ক্ষেত্রে **শ্বসন, রেচন, দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ** প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে এই তন্ত্র সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

(খ) **কঙ্কালতন্ত্র** (Skeletal system) : এই তন্ত্রই একাধারে দেহের কাঠামো গঠন এবং দেহের ভার বহন করে। কঙ্কালতন্ত্রের প্রধান

উপাদান হ'ল অস্থি, কার্টিলেজ, লিগামেণ্ট ও নানা শক্ত আবরণ। আরশোলা, শামুক প্রভৃতি প্রাণীর দেহের বাইরে যে শক্ত আবরণ পাওয়া যায় তাকে **বহিঃকঙ্কাল** বলে। বহিঃকঙ্কাল দেহের ভিতরের কোমল অঙ্গগুলোকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের ভিতরে শক্ত কঙ্কালের কাঠামোকে **অন্তঃকঙ্কাল** বলে।

(গ) **পেশীতন্ত্র** (Muscular system) : এই তন্ত্রের প্রধান উপাদান পেশী। পেশীকলার আলোচনা প্রসঙ্গে আন্তরযন্ত্রীয় পেশী, কঙ্কালপেশী ও হৃৎপেশীর কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ও স্থানান্তরে গমনাগমন এই পেশীতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

(ঘ) **পাচনতন্ত্র** (Digestive system) : খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, পাচিত রসের শোষণ ও অপাচ্য অংশের নিষ্কাষণ এই তন্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হ'ল **পৌষ্টিক নালী** বা **পাক নালী** ও **পাচন গ্রন্থি**। উপরের উদাহরণে এই তন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

(ঙ) **রক্তসংবহন তন্ত্র** (Blood circulatory system) : **হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা** প্রভৃতি অঙ্গ নিয়ে সংবহন তন্ত্র গঠিত। সংবহনের মাধ্যম হ'ল **রক্ত**। এই তন্ত্রের মাধ্যমে একদিকে যেমন খাদ্যরস ও অক্সিজেন বিভিন্ন কোষে পরিবেশিত হয় অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন কোষ থেকে কার্বন ডায়ক্সাইড, রেচন পদার্থ, অতিরিক্ত রস প্রভৃতি দূষিত পদার্থ বাহিত হয়ে বিশেষ বিশেষ অঙ্গে প্রেরিত হয়। এই তন্ত্রই **উত্তেজক রস** বা **হরমোন** (Hormone) কে যথাস্থানে নিয়ে যায় এবং সংরক্ষিত খাদ্য স্থানান্তরে পৌঁছে দেয়। এক কথায় দেহের ভিতরে নানাবিধ পদার্থের আদান-প্রদান কাজে প্রধান অংশ গ্রহণ করে এই তন্ত্র।

(চ) **শ্বাসতন্ত্র** (Respiratory system) : বাইরে থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করা এবং দেহের ভিতর থেকে কার্বন ডায়ক্সাইড বের করে দেওয়া প্রাণীর বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ। শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমেই এই কাজ চলে। আমাদের শ্বাসযন্ত্র প্রধানতঃ **নাসারন্ধ্র, শ্বাসনালী** ও **ফুসফুস**—এই তিন অঙ্গ নিয়ে গঠিত। মাছের শ্বাসযন্ত্র হ'ল ফুলকা। নানা কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে শ্বাসনালীই প্রধান শ্বাসযন্ত্র।

(ছ) **রেচনতন্ত্র** (Excretory system) : বিপাকের ফলে উপজাত বর্জনীয় পদার্থ এই তন্ত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রাণিদেহে নানা রকমের রেচন অঙ্গ এই তন্ত্র গঠন করে। তবে মেরুদণ্ডীর প্রধান রেচন অঙ্গ **বৃক্ক, গবিনী ও মূত্রস্থলী।**

(জ) **নার্ভতন্ত্র** (Nervous system) : পরিবেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা ও দেহের নানাবিধ তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই নার্ভতন্ত্রের কাজ। এই তন্ত্রভুক্ত অঙ্গ হল **মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড ও নানাবিধ নার্ভ।**

(ঝ) **জননতন্ত্র** (Reproductive system) : এই তন্ত্র প্রাণীর বংশ বিস্তারের সহায়ক। এই তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ **শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়** এবং তৎসংলগ্ন নালী। নানা সাহায্যকারী গ্রন্থিও এই তন্ত্রের বিশেষ অঙ্গ।

(ঙ) **এণ্ডোক্রিনতন্ত্র** (Endocrine system) : প্রাণিদেহে কতকগুলি নালীবিহীন গ্রন্থি আছে। প্রধানতঃ এই নালীবিহীন গ্রন্থি থেকে **উত্তেজক রস** বা **হরমোন** নির্গত হয়। হরমোন অত্যন্ত সক্রিয় পদার্থ। হরমোন সৃষ্টিকারী গ্রন্থিগুলিকে **এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি** বলে। এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি নিয়ে গঠিত তন্ত্রকেই **এণ্ডোক্রিন তন্ত্র** বলে। **পিটুইটারী, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, গোনাড (শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়), অগ্ন্যাশয়, পাক ও গ্রহণীর শ্লেষ্মাঝিল্লি** ইত্যাদি এই তন্ত্রভুক্ত অঙ্গ।*

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে দশম শ্রেণীতে জানতে পারবে

৪ প্রাণীর বিভিন্ন তন্ত্র ও তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা

[Outline idea of different systems with functions of Animals]

প্রাণীর বিভিন্ন কলা ও অঙ্গ সম্বন্ধে আগের অধ্যায়ে জেনেছো। কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গের মিলনে কিভাবে বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত হয় তাও বলা হয়েছে। এখন প্রাণীর বিভিন্ন তন্ত্র ও তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানতে হবে।

নিচে দুটি অমেরুদণ্ডী ও একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিভিন্ন তন্ত্র ও তাদের কার্যকলাপের বিবরণ দেওয়া হল:

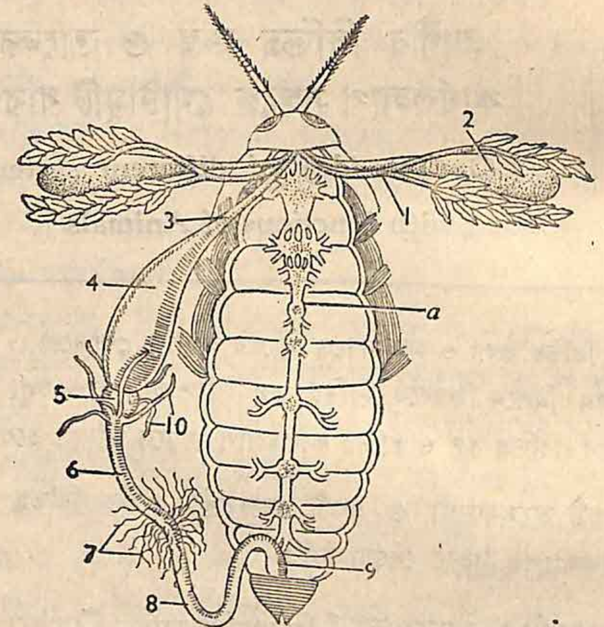
ক. অমেরুদণ্ডী: আরশোলা [Invertebrate : Cockroach]

কঙ্কালতন্ত্র (Skeletal system): সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে আরশোলার বহিরাকৃতির বিবরণ প্রসঙ্গে বহিঃকঙ্কাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তোমরা জান আরশোলার সারা দেহ বাদামী রংয়ের শক্ত কাইটিনময় কিউটিকলে ঢাকা। কিউটিকলের নিচে অবস্থিত বহিস্ত্বকের ক্ষরণ থেকেই ওই শক্ত বহিঃকঙ্কাল তৈরী। দেহের ভিতরের তন্ত্রগুলিকে রক্ষা করা ও বিভিন্ন পেশীকে ধরে রাখাই এর প্রধান কাজ।

পাচনতন্ত্র (Digestive system): মুখোপাঙ্গ, পাকনালী বা পৌষ্টিকনালী, একজোড়া লালাগ্রন্থি ও কয়েকটি যকৃৎ সিকা নিয়ে আরশোলার পাচনতন্ত্র গঠিত।

(ক) **মুখোপাঙ্গ:** মাথার অঙ্কদেশে মুখকে ঘিরে রেখেছে কয়েকটি মুখোপাঙ্গ। এই মুখোপাঙ্গ হল একটি ল্যাব্রম (Labrum), দুটি ম্যাক্সিলা

(Maxilla) দুটি ম্যানডিবল (Mandible) একটি লেবিয়ম (Labium) ও



চিত্র নং ৩১—আরশোলার পাচনতন্ত্র [স্নায়ুতন্ত্রটিও (a) দেখা যাচ্ছে] :
1—লালানালী- 2—লালাধার, 3—অন্ননালী, অন্ননালীর অগ্রবর্তী অংশ-গলবিল, 4—ক্রপ, 5—গিজার্ড, 6—মেসেনটেরন, 7—ম্যালপিজিয়ান নালিকা, 8—ইলিয়ম, 9—মলাশয়, 10—যকৃতসিকা।

জিবের আকৃতিবিশিষ্ট একটি অঙ্গ বা হাইপোফ্যারিংস (Hypopharynx) মুখোপাঙ্গই খাদ্য গ্রহণ ও আংশিকভাবে খাদ্য পেষণের সহায়তা করে।

(খ) পাকনালী : মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত পাকনালী দেহের চেয়ে লম্বা। তাই এটি দেহের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। এই নালীকে অন্ত্র বলে। মুখছিদ্রের পরের অংশ মুখবিবর। মুখবিবরের মধ্যে রয়েছে হাইপোফ্যারিংস। মুখবিবরের পরের সরু অংশকে বলে অন্ননালী (Oesophagus)। বুকের অংশে এই অন্ননালী মোটা হয়ে একটি পাতলা প্রাকারবিশিষ্ট লম্বা থলিতে পরিণত হয়েছে। এই থলিকে ক্রপ (Crop) বলে। ক্রপ উদর পর্যন্ত বিস্তৃত। এতে খাদ্য সাময়িকভাবে

জমা থাকে। ক্রপের পরেই পুরু প্রাকারবিশিষ্ট শাঙ্কব পেশীবহুল গিজার্ড (Gizzard) অবস্থিত। গিজার্ডের অন্তঃপ্রাকার শক্ত কিউটিকলে ঢাকা। গিজার্ডের মধ্যে কিউটিকল্ ছয়টি ভাঁজের সৃষ্টি করেছে। এই ভাঁজগুলিকে গিজার্ডের দাঁত বলে। এই অংশে খাদ্য পিষ্ট হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়।

গিজার্ডের পরের অংশই মধ্যান্ত্র। সরু নলবিশিষ্ট এই অংশের প্রাকারে আছে কলমনার এপিথেলিয়ম। গিজার্ডের পরেই অন্ত্রের গায়ে রয়েছে সাতটি বা আটটি যাকৃত সিকা (Hepatic caeca)। একমুখ বন্ধ এই ফাঁপা নলাকার সিকা থেকে নির্গত জারক রস নিচে অন্ত্রের পরের অংশে আসে। এখানেই খাদ্যের পাচন ও আংশিক শোষণ ঘটে। তাই এই অংশকে পাকস্থলী বলে।

পাকনালীর বাকী অংশ বেশ লম্বা। এর প্রাকারও কিউটিকল দিয়ে গড়া। এর প্রথম অংশকে বলে মেসেনটেরন। মেসেনটেরন ও ইলিয়মের সংযোগস্থলে সরু সরু সুতোর মত ঈষৎ হলুদ রংয়ের অসংখ্য নালিকা আছে। এগুলি হল ম্যালপিজিয়ান নালিকা (Malpighian tubules)। ইলিয়মের পরে অপেক্ষাকৃত মোটা অংশটি কোলন বা বৃহদন্ত্র (Large ntestine) নামে পরিচিত। বৃহদন্ত্র বেশ লম্বা ও কুণ্ডলীকৃত। এই অংশে জল ও কিছু পরিমাণ খাদ্য শোষিত হয়। পশ্চাৎ অন্ত্রের শেষ অংশকে বলে মলাশয় (Rectum)। মলাশয় অপেক্ষাকৃত স্ফীত ও সংক্ষিপ্ত অংশ। মলাশয়ের প্রাকার পুরু। এই অংশে অপাচ্য খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে। মলাশয় দেহের শেষপ্রান্তের যে ছিদ্রতে মুক্ত হয় তাকে পায়ু বলে। এই পথে অপাচ্য খাদ্য দেহের বাইরে আসে।

আরশোলার পাচনগ্রন্থি হল লালাগ্রন্থি ও যকৃৎগ্রন্থি। অন্ননালীর দু'পাশে একজোড়া করে লালাগ্রন্থি ও একটি করে লালাধার আছে। লালাগ্রন্থি থেকে নির্গত লালা প্রথমে লালাধারে জমা হয়। পরে নালীপথে মুখবিবরে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে এবং পাচনে সাহায্য করে।

লালাগ্রন্থি, লালাধার ও নালীগুলিকে একত্রে লালাযন্ত্র (Salivary apparatus) বলে।

রক্ত-সংবহন তন্ত্রঃ আরশোলার রক্তসংবহনতন্ত্র খুব পরিপুষ্ট নয়। রক্ত, হৃৎপিণ্ড, অ্যাওর্টা বা মহাধমনী নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত হলেও কোন শিরা বা জালক নেই।

আরশোলার রক্তের রং সাদা। রক্তের মাধ্যমে শ্বসন কাজ চলে না। তাই এর রক্তের মধ্যে **শ্বাসরঙ্গক** (Respiratory pigment) থাকে না। এদের রক্তে কেবল প্লাজামা ও অ্যামিবাকৃতি শ্বেতকণিকা আছে। এই রক্তকে **হিমোলিম্প** (Haemolymph) বলে।



চিত্র নং ৩২ – আরশোলার রক্তসংবহন ও পেশীতন্ত্র

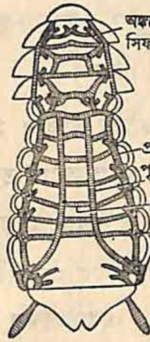
হৃৎপিণ্ডটি নলাকার এবং পেরিকাডিয়াল সাইনসের মধ্যে অবস্থিত। ফানেল আকৃতির **তেরটি প্রকোষ্ঠ** সহযোগে হৃৎপিণ্ড গঠিত। প্রতি প্রকোষ্ঠ সম্মুখের প্রকোষ্ঠের সঙ্গে কপাটকের সাহায্যে যুক্ত। প্রতি প্রকোষ্ঠে এক জোড়া করে ছিদ্র (অস্টিয়া) আছে। এই ছিদ্রপথে পেরিকার্ডিয়াল সাইনসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। ছিদ্রগুলি ভাল্ভ বা কপাটক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; হৃৎপিণ্ডের সম্মুখভাগ থেকে পৃষ্ঠমহাধমনী (Dorsal aorta) বের হয়েছে। এই ধমনী মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত।

দেহগহ্বর থেকে রক্ত কয়েকটি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে পেরিকার্ডিয়াল সাইনসে আসে এবং অস্টিয়া দিয়ে হৃৎপিণ্ডে যায়। সেই রক্ত অ্যাওর্টা পথে প্রবাহিত হয়ে পরিশেষে দেহগহ্বরে ফিরে আসে।

পেশীতন্ত্রঃ আরশোলার দেহে অ্যালারী পেশী (Allary

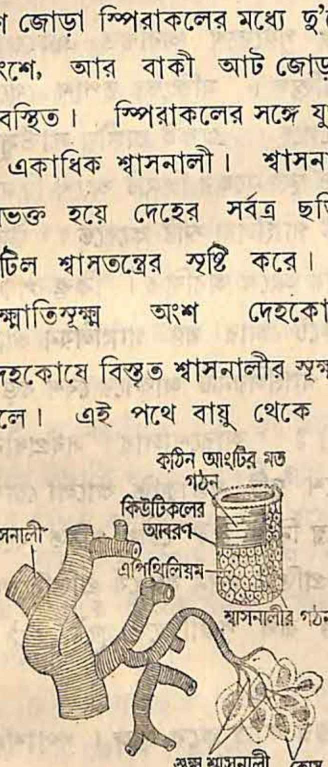
muscle) নামে পাখার মত পেশী শ্রেণীবদ্ধভাবে পেরিকার্ডিয়াল প্রাকারের সঙ্গে যুক্ত। এই পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই রক্ত সঞ্চালিত হয়।

শ্বাসতন্ত্র ঃ শাখা-প্রশাখাযুক্ত বায়ুনল বা শ্বাসনালীই (Tracheae) আরশোলার প্রধান শ্বাসঅঙ্গ। শ্বাসছিদ্র বা স্পিরাকল (Spiracle)-এর সাহায্যেই শ্বাসনালী পথে বায়ুমণ্ডলের ও দেহের ভিতরের গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটে। দশ জোড়া স্পিরাকলের মধ্যে দু'জোড়া বুকের অংশে, আর বাকী আট জোড়া উদর দেশে অবস্থিত। স্পিরাকলের সঙ্গে যুক্ত থাকে এক বা একাধিক শ্বাসনালী। শ্বাসনালী ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় এবং জটিল শ্বাসতন্ত্রের সৃষ্টি করে। এই নালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ দেহকোষে বিস্তৃত।



চিত্র নং ৩৩
আরশোলার শ্বাসতন্ত্র

দেহকোষে বিস্তৃত শ্বাসনালীর সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখাকে ট্রাকিওল (Tracheole) বলে। এই পথে বায়ু থেকে কোষে অক্সিজেন আসে এবং কোষ থেকে কার্বন ডায়ক্সাইড দেহের বাইরে যায়। এই গ্যাসের আদান-প্রদানে রক্ত কোন অংশ গ্রহণ করে না।



চিত্র নং ৩৪—আরশোলার শ্বাসনালীর বিন্যাস ও গঠন

শ্বসনের সময় আরশোলার দেহ নিয়মিত পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। এরই ফলে শ্বসন কাজ চলে। স্পিরাকলের মুখে ভাল্‌ভ বা কপাটক থাকায় বায়ুর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয়।

রেচনতন্ত্র ঃ আরশোলার প্রধান রেচন অঙ্গ হ'ল **ম্যালপিজিয়ান নালিকা**। এই সরু নালিকাগুলি সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই নালিকাগুলির মুক্তপ্রান্ত অন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত। অন্য প্রান্ত বন্ধ। একস্তর

প্রাকারবিশিষ্ট এই নালিকাগুলি দেহরস থেকে বর্জনীয় পদার্থ সংগ্রহ করে অন্ত্রে নিক্ষেপ করে। সংগৃহীত রস থেকে জলীয় পদার্থ নালিকা পথে পুনরায় শোষিত হয়। ফলে প্রায় শুষ্ক এই পদার্থ পায়ু পথে অপাচ্য খাদ্যের সঙ্গে বের হয়ে যায়।

নার্ভতন্ত্র ঃ নার্ভতন্ত্র প্রধানতঃ **মস্তিষ্ক** ও **অঙ্কীয় নার্ভসূত্র** দ্বারা গঠিত। (চিত্র নং ৩১ দেখ)।

আরশোলার মাথার মধ্যে অন্ননালীর পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত একজোড় বড় আকৃতির গ্যাংলিয়াই হল আরশোলার **মস্তিষ্ক**। মস্তিষ্কের দুপাশ থেকে মোটা নার্ভসূত্র বের হয়ে অঙ্কদেশে চলে গেছে। একেই **অঙ্কীয় নার্ভসূত্র** (Ventral nerve cord) বলে। এই নার্ভসূত্র বুকের তিনটি অংশে তিনটি বড় গ্যাংলিয়া এবং উদর অংশে ছয়টি ছোট গ্যাংলিয়া সৃষ্টি করেছে। উদর গ্যাংলিয়ার প্রথম চারটি উদর খণ্ডের প্রথম চার অংশে অবস্থিত। কিন্তু পঞ্চম গ্যাংলিয়ন উদরের পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের নিকটে আর ষষ্ঠ গ্যাংলিয়ন প্রায় দেহের শেষ অংশে অবস্থিত। এই শেষ উদর গ্যাংলিয়নটি আকারে বেশ বড়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ (Sense organs) **ঃ** আরশোলার সর্বপ্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয় হল **দর্শনেন্দ্রিয়**। মাথার দুপাশে দুটি বৃক্কাকৃতি কালো চোখ আছে। অনেকগুলি সরলাক্ষির মত দর্শন যন্ত্র নিয়ে এই চোখ গঠিত বলে একে পুঞ্জাক্ষি (Compound eye) বলে। প্রতিটি দর্শন যন্ত্র যে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে তাদের মিলনে বর্ণহীন খণ্ড খণ্ড রূপ পুঞ্জাক্ষিতে ফুটে ওঠে। পুঞ্জাক্ষি বৃন্তহীন।

আরশোলার **ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে শুঙ্গ**। স্পার্শন গ্রাহক প্রধানতঃ শুঙ্গে অবস্থিত হলেও সমস্ত দেহে ছড়িয়ে আছে। আরশোলার কোন শ্রবণেন্দ্রিয় নেই।

জননতন্ত্র ঃ আরশোলা একলিঙ্গ প্রাণী ; কারণ পুং-জননতন্ত্র ও স্ত্রী-জননতন্ত্র একই আরশোলার দেহে থাকে না। নিচে জননতন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হল।

পুংজননতন্ত্র ঃ এই তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ শুক্রাশয় (Testes)। দেহের তুপাশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ উভয় খণ্ডের মধ্যে একটি করে মোট তুটি লম্বাটে ধরনের শুক্রাশয় আছে। প্রতি শুক্রাশয় ৩০টি থেকে ৫০টি গুটি বা ফলিকল (Follicle দিয়ে সৃষ্টি। প্রতি শুক্রাশয় থেকে একটি করে **শুক্রনালী** বের হয়ে দেহের পশ্চাৎ অংশের অঙ্কদেশে নেমে আসে। পরিশেষে সেই দিকের **শুক্রথলিতে** মুক্ত হয়। শুক্রথলি তুটি কাছাকাছি অবস্থিত। এই থলি তুটি থেকে এক মুখ বদ্ধ অসংখ্য ছোট ছোট থলি উৎপন্ন হয়। ফলে শুক্রথলি তুটি একত্রে ব্যাঙের ছাতার আকার ধারণ করে। তাই এর নাম **মাসরুম গ্রন্থি** (Mushroom gland)।



চিত্র নং ৩৫—
আরশোলার পুং-জননতন্ত্র

শুক্রথলি তুটি আবার যে পেশীবহুল মধ্যনালীতে মুক্ত তার নাম **ইজেকুলেটরী ডাক্ট**। ইজেকুলেটরী ডাক্ট পরিশেষে জনন থলিতে এসে পড়ে। **জননথলি** উদরের নবম খণ্ডে অবস্থিত। যে ছিদ্রপথে ইজেকুলেটরী ডাক্ট জননথলিতে মুক্ত হয় তার নাম পুং-জনন ছিদ্র। **কনগ্লোবেট গ্রন্থি** নামে লম্বাটে ধরনের একটি গ্রন্থি ইজাকুলেটরী ডাক্টের অঙ্কদেশে অবস্থিত। এই গ্রন্থিও জননথলিতে মুক্ত হয়েছে।

শুক্রাশয়ে উৎপন্ন শুক্রাণু শুক্রনালীর মধ্য দিয়ে এসে শুক্রথলিতে জমা হয়। পরে ইজেকুলেটরী নালী পথে জননথলিতে আসে।

স্ত্রী-জননতন্ত্র ঃ এই তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ এক জোড়া **ডিম্বাশয়** (Ovaries)। উদর গহ্বরে দেহের পশ্চাৎদিকে তুধারে ডিম্বাশয় তুটি অবস্থিত। প্রতি ডিম্বাশয়ে আছে আটটি লম্বা নালিকা। এই নালিকাগুলিকে **ওভারিওল** (Ovarioles) বলে। প্রতি ওভারিওলের অগ্রভাগ মুক্ত এবং সরু সূতোর মত।



চিত্র নং ৩৬—
আরশোলার স্ত্রী জননতন্ত্র

এর মাঝের অংশ স্ফীত এবং পিছন দিকের গোড়ার অংশ হল নলাকার বৃন্ত। উভয়দিকেই ওভারিওল বৃন্তগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি করে মোট দুটি ডিম্বনালী সৃষ্টি করেছে। ডিম্বনালী দুটি মিলিত হয়ে যে সাধারণ নালী সৃষ্টি করে তাকে যোনি বলে। এই যোনি স্ত্রী-জনন ছিদ্রপথে জননথলিতে মুক্ত। স্ত্রী-জনন ছিদ্র দেহের অষ্টম খণ্ডে অবস্থিত।

ডিম্বনালী দুটির মাঝখানে এক জোড়া **শুক্রধানী** (Spermatheca) থাকে। শুক্রধানী দুটি একটি ছিদ্র পথে জননথলিতে মুক্ত। পুরুষ আরশোলার থেকে পাওয়া শুক্রাণু সাময়িকভাবে স্ত্রী-আরশোলার শুক্রধানীতে সঞ্চিত থাকে। এদিকে **কোলেটারিয়াল গ্রন্থি** (Colleterial gland) নামে এক জোড়া শাখা-প্রশাখাযুক্ত নলাকার গ্রন্থি স্ত্রী-জননছিদ্রের নিকটে যোনিতে মুক্ত।

ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ডিম্বাণু ডিম্বনালী পথে যোনিতে আসে। নিষিক্ত ডিম্ব স্ত্রী-জনন ছিদ্র দিয়ে বাইরে যায়। কোলেটেরিয়াল গ্রন্থির ক্ষরণ থেকে নিষিক্ত ডিমের আবরণ সৃষ্টি হয়।

অমেরুদণ্ডী : কেঁচো (Invertebrate : Earthworm)

ত্বকতন্ত্র ও দেহপ্রাকার—কেঁচোর দেহ পাতলা স্বচ্ছ নরম কিউটিকলে ঢাকা। কিউটিকলের নিচেই **বহিস্ত্বক** অবস্থিত। একসারি এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা এই ত্বক গঠিত। এই স্তরের কয়েকটি কোষ গ্রন্থিতে পরিবর্তিত হয়ে শ্লেষ্মা (mucus) সৃষ্টি করে। আবার কতকগুলি কোষ গ্রাহকে (Receptor) পরিবর্তিত হয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ করে। বহিস্ত্বকের নিচে থাকে পাতলা একস্তর **চক্রপেশী**। চক্রপেশীর নিচেই আছে পুরু একস্তর অনুদৈর্ঘ্য পেশী। দেহ প্রাকারের ভিতরের স্তরে পেরিটোনিয়ম



চিত্র নং ৩৭—কেঁচোর দেহের প্রস্থচ্ছেদ

নামে পাতলা মসৃণ এপেথেলিয়ম আছে। চক্রপেশীর মধ্যে রঙ্গক কোষ, যোগকলা, রক্তজালক বিস্তৃত। **চক্রপেশীর সঙ্কোচনের ফলে দেহ প্রসারিত হয় আবার অনুদৈর্ঘ্য পেশীর সঙ্কোচনে দেহ ছোট বা খর্ব হয়।**

পাচনতন্ত্র ঃ এই তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ **পৌষ্টিকনালী**। এই নালী দেহের অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত মুখ থেকে শেষ প্রান্তে অবস্থিত পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুখছিদ্রটি পাতলা প্রাকারবিশিষ্ট মুখবিবরে মুক্ত হয়। মুখবিবরের পরের অংশ **গলবিল**। দেহের ৩য় ও ৪র্থ দেহখণ্ডে অবস্থিত গলবিলের প্রাকার পুরু ও পেশীবহুল। এর অগ্রভাগ চ্যাপ্টা কিন্তু পশ্চাৎভাগ সরু। গলবিলের পৃষ্ঠদেশে গুটি ও রক্তনালীর মিলনে **গলবিলীয় গ্রন্থি** সৃষ্টি হয়েছে। এই গ্রন্থি থেকে লালা বের হয়ে খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যকে আংশিকভাবে পরিপাক করাতে সহায়তা করে।



চিত্র নং ৩৮—
কেঁচোর পাচনতন্ত্র

গলবিলের পরের অংশ **অন্ননালী**। এই অংশ সরু। অন্ননালী ৮ম দেহখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। ৮ম দেহখণ্ডে অন্ননালী পরিবর্তিত হয়ে একটি ডিমের আকারে পরিণত হয়েছে। এই অংশকে **গিজার্ড** বলে। গিজার্ড শক্ত, পেশীবহুল ও গোলাকার। এর ভিতরের স্তর কিউটিকলযুক্ত। খাদ্য এই অংশে নিষ্পেষিত হয়ে সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয়।

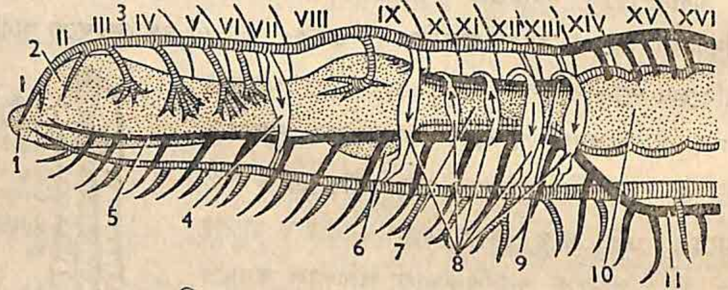
গিজার্ডের পরের অংশ **পাকস্থলী**। পাকস্থলী দেহের ৯ম থেকে ১৪শ দেহখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অংশের প্রাকার গ্রন্থিবহুল ও রক্তনালীতে সমৃদ্ধ। এখানে খাদ্যের পরিপাক ঘটে।

পাকস্থলীর পরের অংশ লম্বা ও অপেক্ষাকৃত মোটা। তবে এই অংশের প্রাকার পাতলা। এই অংশকে অন্ত্র বলে। ২৬শ দেহখণ্ডে অন্ত্রের উভয়দিকে

একটি করে মোট দুটি ঈষৎ লম্বা সরু মাংসখণ্ড দেখা যায়। এদের প্রত্যেকটিকে আন্ত্র সিকম (Intestinal caecum) বলে।

অন্ত্রের শেষ অংশ পায়ু। এই গোলাকার ছিদ্রটি দেহের শেষপ্রান্তে অবস্থিত। এই ছিদ্রপথে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় অপাচ্য পদার্থ দেহের বাহিরে আসে।

রক্তসংবহন তন্ত্র ঃ কেঁচোর রক্তসংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ কয়েকটি রক্তবাহ (Blood vessel)। **এদের রক্তরসে হিমোগ্লোবিন দ্রবীভূত**



চিত্র নং ৩৯—কেঁচোর রক্ত সংবহনতন্ত্র

(I—XVI) দেহখণ্ড

1—মুখাগ্র, 2—গলবিল, 3—পৃষ্ঠ রক্তবাহ, 4—হৃৎপিণ্ড, 5—পার্শ্ব অন্ননালীদেশীয় রক্তবাহ, 6—গিজার্ড, 7—পাকস্থলী, 8—ডানদিকের দুটি এবং বামদিকের একটি হৃৎপিণ্ড, অন্য দুটি সঙ্কোচনশীল নালী, 9—উর্ধ্ব অন্ত্রদেশীয় রক্তবাহ, 10—অন্ত্র, 11—অধঃনার্ভীয় রক্তবাহ

থাকে বলে এই রক্তের রং লাল। তাছাড়া এই রক্তরসে ভাসমান অবস্থায় থাকে বর্ণহীন, নিউক্লীয়সবিহীন অ্যামিবাকৃতি কতকগুলি কোষ।

কয়েকটি রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হয়। এই রক্তবাহের প্রাকার পেশীবহুল। পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই রক্তবাহের মধ্যে রক্ত চলাচল করে। কয়েকটি একমুখী কপাটক (valve) রক্তের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অসংখ্য শাখাবাহের মধ্য দিয়ে রক্ত জালকে আসে। কেঁচোর দেহে প্রকৃত হৃৎপিণ্ড নেই। ৭ম, ৯ম, ১২শ, ১৩শ দেহখণ্ডের প্রত্যেকটিতে একজোড়া করে যে চার জোড়া মোটা ফাঁসের মত

রক্তবাহ আছে সেগুলিই হৃৎপিণ্ডের কাজ করে। প্রধান তিনটি রক্তবাহের নাম ও অবস্থান নিম্নরূপ :

(ক) **পৃষ্ঠরক্তবাহ :** দেহপ্রাকার ও প্যাকনালীর অন্তবর্তী স্থানে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর এই বাহ বিস্তৃত। বাইরে থেকে পৃষ্ঠ রক্তবাহের অস্তিত্ব বোঝা যায়। এটা প্রধানতঃ রক্ত সংগ্রহকারী বাহ। কয়েক জোড়া নালীর মাধ্যমে অন্ত্র থেকে রক্ত এই বাহতে আসে এবং বাহর মধ্যে দিয়ে সম্মুখদিকে প্রবাহিত হয়। কয়েকটি কপাটক থাকায় রক্ত এই বাহর পিছনদিকে প্রবাহিত হতে পারে না। কিন্তু অন্ত্রের সম্মুখবর্তী অংশে, অর্থাৎ ১৪শ দেহখণ্ড থেকে সামনের দিকে এই বাহর কাজের পরিবর্তন ঘটে ; বাহ প্রচুর শাখাবাহ সৃষ্টি কোরে এই অংশের পাকনালীতে রক্ত সরবরাহের কাজ করে। আবার কিছু পরিমাণ রক্ত হৃৎপিণ্ড রক্তবাহ দিয়ে অঙ্করক্তবাহে আসে।

(খ) **অঙ্করক্তবাহ :** পাকনালীর তলদেশের মধ্য অক্ষরেখার উপর এই বাহ অবস্থিত। ইহা সরবরাহকারী নালী। অঙ্করক্তবাহের মধ্যে কোন কপাটক নেই। পৃষ্ঠরক্তবাহ ও অঙ্করক্তবাহ তথাকথিত হৃৎপিণ্ড দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে।

(গ) **অধঃনার্ভীয় বা সাব-নিউরাল রক্তবাহ :** অঙ্কীয় নার্ভসূত্রের তলায়, মধ্যঅঙ্করেখার উপরে এই বাহ অবস্থিত। দেহের ১৩শ খণ্ডে এই বাহ পার্শ্ব অন্ননালীদেশীয় রক্তবাহ নামে দুভাগে বিভক্ত হয়ে সামনের দিকে বিস্তৃত হয়েছে। রক্ত সংগ্রহ করাই এই বাহর কাজ।

উপরে আলোচিত তিনটি প্রধান বাহ ছাড়াও কেঁচোর দেহে আরও অনেক রক্তবাহ আছে। উর্ধ্ব অন্ত্রদেশীয় রক্তবাহ নামে একটি ছোট বাহ পৃষ্ঠরক্তবাহের তলায় ও অন্ননালীর উপরে অবস্থিত এবং দেহের নবম খণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। দুজোড়া ছোট লুপের মাধ্যমে এই বাহ পার্শ্ব অন্ননালীদেশীয় রক্তবাহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। একজোড়া লুপ দশম এবং অপর জোড়া একাদশ দেহখণ্ডে অবস্থিত।

শ্বাসতন্ত্র : কেঁচোর দেহে সুসংবদ্ধ শ্বাসতন্ত্র নেই।

রেচনতন্ত্র ঃ কেঁচোর প্রধান রেচন অঙ্গকে নেফ্রিডিয়ম* বলে। প্রথম তুটি দেহখণ্ড ও শেষ দেহখণ্ড ছাড়া প্রতি দেহখণ্ডে নেফ্রিডিয়া আছে। নেফ্রিডিয়ম কুণ্ডলীকৃত নালীর মত। এর উভয় দিকই উন্মুক্ত।

আদর্শ নেফ্রিডিয়মের ভিতরের উন্মুক্ত দিক সিলিয়াযুক্ত এবং ফানেল আকৃতি-বিশিষ্ট। এই অংশকে **নেফ্রোস্টোম** (Nephrostome) বলে। নেফ্রোস্টোম দেহ-গহ্বর বা সিলোমের মধ্যে অবস্থিত। অপর প্রান্ত প্রান্তনালীতে মুক্ত। প্রান্তনালী সাধারণ রেচননালীর সঙ্গে মিশেছে।

নেফ্রোস্টোম ও প্রান্তনালীর মধ্যবর্তী অংশকে **নেফ্রিডিয়াল নালী** বলে। এই নালী লম্বাকৃতি, খর্বাকৃতি, কুণ্ডলাকৃতি প্রভৃতি নানা প্রকারের হয়। নালীর মধ্যে সূক্ষ্ম সূতার মত অনেক সিলিয়া থাকে। এই নালীর সংস্পর্শে রক্তনালী আছে।

নেফ্রোস্টোম সিলোম থেকে সিলোমিক ফ্লুইড সংগ্রহ করে নালীপথে পাঠিয়ে দেয়। বর্জনীয় পদার্থ এই নালীতে সংগৃহীত হয়ে প্রান্তনালীপথে সাধারণ মোটা রেচননালীতে আসে। রেচননালী দিয়ে এই বর্জনীয় পদার্থ অন্ত্রে আসে এবং পায়ুপথে দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

কেঁচোর নেফ্রিডিয়া তিন প্রকার ঃ দেহের প্রস্থ প্রাকারের সেপ্টমে অবস্থিত **সেপ্টাল নেফ্রিডিয়া** (Septal nephridia), ত্বকে অবস্থিত **ত্বকীয় নেফ্রিডিয়া** (Integumentary nephridia) এবং গলবিলে অবস্থিত **গলবিলীয় নেফ্রিডিয়া** (Pharyngeal nephridia)।

সেপ্টাল নেফ্রিডিয়া হল আদর্শ নেফ্রিডিয়া। ১৫শ দেহখণ্ড থেকে প্রতি পশ্চাৎখণ্ডের সেপ্টমে এই নেফ্রোডিয়া অবস্থিত। প্রতি সেপ্টমের উভয়দিকে প্রায় ৫০টি নেফ্রিডিয়া থাকে।

ত্বকীয় নেফ্রিডিয়া দেহত্বকে অবস্থিত! প্রথম তুটি খণ্ড ছাড়া প্রতি দেহখণ্ডে প্রায় দশটি ত্বকীয় নেফ্রিডিয়া পাওয়া যায়। এদের আকার ইংরেজী **'U'**-এর মত। এই নেফ্রিডিয়মে নেফ্রোস্টোম থাকে না। দেহগাত্রে অবস্থিত

---

*একবচন—নেফ্রিডিয়ম, বহুবচন—নেফ্রিডিয়া।

নেফ্রিডিয়োপোর (nephridiopore) নামে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বর্জনীয় পদার্থ বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দেহখণ্ডে গলবিলীয় নেফ্রিডিয়া গুচ্ছাকারে অবস্থিত। এই নেফ্রিডিয়ার নেফ্রোস্টোম ও নেফ্রিডিয়োপোর নেই। এদের শেষপ্রান্তগুলি যুক্ত হয়ে একটি সাধারণ রেচননালীর সৃষ্টি করে। সেই নালী গলবিলের গহ্বরে এসে মুক্ত হয়।

নার্ভতন্ত্র : কেঁচোর নার্ভতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ **মস্তিষ্ক**। তৃতীয় দেহখণ্ডে গলবিলের পৃষ্ঠদেশে মধ্যরেখার দুপাশে **সেরিব্রাল** বা **সুপ্রাফ্যারিনজিয়াল** নামে দুটি গ্যাংলিয়া খুব কাছাকাছি অবস্থিত। ঐ দুটিকে কেঁচোর মস্তিষ্ক বলে। মস্তিষ্ক থেকে নার্ভ বের হয়ে এই অংশে ছড়িয়ে আছে।

দেহের ৪র্থ খণ্ডে গলবিলের ঠিক নিচেই আছে একজোড়া **সাব-ফ্যারিনজিয়াল গ্যাংলিয়া**। **সারকামফ্যারিনজিয়াল কানেকটিভ** নামে এক জোড়া নার্ভসূত্র গলবিলকে বেষ্টন করে উভয়দিকের সুপ্রাফ্যারিনজিয়ালের সঙ্গে সেইদিকের সাব-ফ্যারিনজিয়ালকে যুক্ত করে একটি **নার্ভ রিং** সৃষ্টি করে। সাব-ফ্যারিনজিয়াল গ্যাংলিয়া ও নার্ভ রিং থেকে ছোট ছোট নার্ভ বের হয়ে এই অংশে ছড়িয়ে আছে।

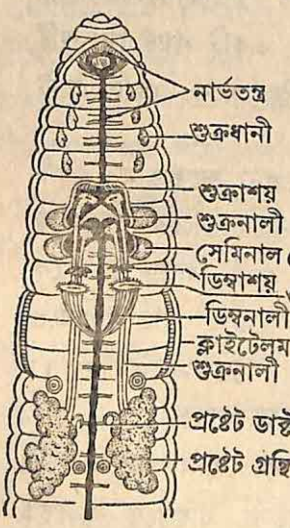
সাব-ফ্যারিনজিয়াল গ্যাংলিয়া থেকে নির্গত মোটা সূতোর মত একটি নার্ভসূত্র অঙ্কীয় মধ্যরেখার উপর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে দেহের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। দুটি নার্ভসূত্রের মিলনে এই সূত্রটি গঠিত। একে বলে **অঙ্কীয় নার্ভসূত্র**। দেহের চতুর্থ খণ্ডের পর থেকে প্রতি দেহখণ্ডে এই নার্ভসূত্র একটি করে গ্যাংলিয়ন সৃষ্টি করে (চিত্র নং ৪০ দেখ)। গ্যাংলিয়া থেকে নার্ভ বের হয়ে দেহের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় : চোখ, শুঙ্গ, কর্ষিকা প্রভৃতি সুস্পষ্ট কোন অঙ্গ কেঁচোর দেহে না থাকলেও কতকগুলি গ্রাহক যন্ত্র আছে। বহিত্বকে অবস্থিত লম্বা সরু গ্রাহককোষ দলবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। এরাই স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। বহিত্বকের পৃষ্ঠদেশে **ফটোরিসেপটর** (Photoreceptor) নামে আলোক সুবেদী কোষ আছে। তাছাড়া স্বাদ ও ঘ্রাণগ্রাহক কোষ দলবদ্ধভাবে মুখবিবরের মধ্যে সজ্জিত থাকে।

জননতন্ত্র : একই কেঁচোর দেহে পুং ও স্ত্রী উভয় জনন অঙ্গ বর্তমান। তাই কেঁচো **উভলিঙ্গ প্রাণী**। নিচে উভয় জননতন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হল।

পুংজননতন্ত্র : অন্ননালীর নিচে দেহের ১০ম ও ১১শ খণ্ডের প্রত্যেকটিতে একজোড়া করে মোট দুজোড়া **শুক্রাশয়** আছে। অঙ্কীয় নার্ভসূত্রের উভয়পাশে শুক্রাশয় অবস্থিত। চারটি থেকে আটটি সাদা আঙ্গুলের মত অংশ নিয়ে এক একটি ক্ষুদ্র শুক্রাশয় গড়ে উঠেছে। প্রতি খণ্ডের শুক্রাশয় দুটি একটি **শুক্রাশয় থলিতে** অবস্থিত। এই শুক্রাশয়থলির ভিতরে প্রতি শুক্রাশয়ের নিচে সিলিয়াযুক্ত একটি করে **শুক্রচুঙ্গী বা সেমিনাল ফানেল** থাকে।

আবার ১১শ ও ১২শ খণ্ডে একজোড়া করে মোট দুজোড়া **সেমিনাল ভেসিকল** বা **শুক্রথলি** আছে। এই থলি বেশ মোটা। ১০শ দেহখণ্ডের শুক্রাশয় থলি ১১শ দেহখণ্ডের শুক্রথলিতে এবং একাদশ দেহখণ্ডের শুক্রাশয় থলি ১২শ দেহখণ্ডের শুক্রথলিতে প্রসারিত। দেখে মনে হয় শুক্রাশয় থলি প্রসারিত হয়েই শুক্রথলিতে পরিণত হয়েছে। শুক্রথলি রসে পূর্ণ। শুক্রাশয় থেকে উৎপন্ন শুক্রাণু ঐ শুক্ররসে পুষ্টিলাভ করে।



চিত্র নং ৪০ – কেঁচোর নার্ভতন্ত্র ও জনন-তন্ত্র

প্রতি শুক্রাশয়ের নিচে অবস্থিত শুক্রচুঙ্গী ক্রমশঃ সরু হয়ে শুক্রনালীতে পরিণত হয়। অঙ্কীয় নার্ভসূত্রের উভয় পাশ দিয়ে একজোড়া শুক্রনালী পাশাপাশি অবস্থায় ১৮শ দেহখণ্ডে নেমে এসে সেই পাশের প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে নির্গত প্রস্টেট ডাক্ট বা নালীর সঙ্গে মিলিত হয়।

প্রস্টেট গ্রন্থি বেশ বড় ও সাদা রংয়ের। এই গ্রন্থি নার্ভসূত্রের উভয় দিকে ১৬শ থেকে ২১শ দেহখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রস্টেট নালী ও সেই পাশের দুই শুক্রনালী মিলিত-শুক্রনালী সৃষ্টি করে। ১৮শ দেহখণ্ডের অঙ্কদেশে দু'পাশে দু'টি পুং-জননছিদ্র অবস্থিত। প্রতিদিকের শুক্রনালী সেই পাশের পুং-জননছিদ্রে মুক্ত হয়। এই জননছিদ্র দিয়ে শুক্রাণু দেহ থেকে বের হয়ে আসে।

১৭শ ও ১৯শ দেহখণ্ডের অঙ্কদেশে পুং-জননছিদ্রের সামনে ও পিছনে যে ঈষৎ উঁচু স্থান দেখা যায় তাকে **জননপিড়কা** (Genital papilla) বলে। জননপিড়কাগুলি জনন কার্যে সহায়ক।

স্ত্রী-জননতন্ত্র ঃ ১২শ ও ১৩শ দেহখণ্ডের মধ্যবর্তী সেপ্টমের পিছনদিকে অঙ্কীয় নার্ভসূত্রের দু'পাশে একটি করে মোট দু'টি সাদা রংয়ের **ডিম্বাশয়** অবস্থিত। একগোছা আঙ্গুলের মত অংশ নিয়ে প্রতি ডিম্বাশয় গঠিত। প্রতি ডিম্বাশয়ের নিচে রয়েছে সিলিয়াযুক্ত **ওভিডিউক্যাল ফানেল** বা **ডিম্বচুঙ্গী**। ডিম্বচুঙ্গী সরু হয়ে ডিম্বনালী গঠন করে। **ডিম্বনালী** ১৩শ দেহখণ্ডে নেমে এসেছে। এই দেহখণ্ডের দু'পাশ থেকে দুই ডিম্বনালী মিলিত হয়ে অঙ্কীয়দেশের মধ্যরেখার উপর অবস্থিত স্ত্রী-জননছিদ্রে মুক্ত হয়। ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ডিম্বাণু ডিম্বনালী বেয়ে এই ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে।

এছাড়া ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম দেহখণ্ডের প্রত্যেকটির দুপাশে একটি করে মোট চারজোড়া শুক্রধানী আছে। প্রতি শুক্রধানীতে আছে একটি গোল থলির মত অংশ ও একটি নালী। নালীগুলি অঙ্কদেশে অবস্থিত শুক্রধানী ছিদ্রের সঙ্গে যুক্ত। ঐ ছিদ্রপথে অন্য কেঁচোর শুক্রাণু শুক্রধানীতে জমা হয়।

কেঁচো উভলিঙ্গ হলেও ডিম্বাণুকে নিজের শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত করে না। শুক্রধানীতে সংগৃহীত অন্য কেঁচোর শুক্রাণু দিয়ে ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়।

খ. মেরুদণ্ডী ঃ ব্যাঙ

[Vertebrate : Toad]

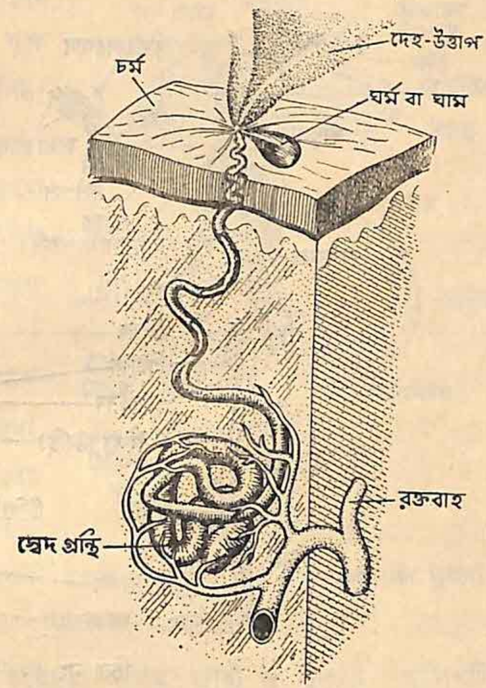
জীববিজ্ঞানীর কাছে মেরুদণ্ডী প্রাণী ব্যাঙের গুরুত্ব সর্বাধিক। ব্যাঙ অতি সহজলভ্য প্রাণী। যে কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহতন্ত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য বিজ্ঞানীরা ব্যাঙকে উপযুক্ত প্রাণী বলে মনে করেন। এখানে ব্যাঙের বিভিন্ন তন্ত্র ও তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা কালে মানুষের বিভিন্ন তন্ত্র ও সেই তন্ত্রগুলির কার্যকলাপ উল্লেখ করা যাবে।

ত্বকতন্ত্র ঃ ব্যাঙের ত্বকতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ চামড়া। ব্যাঙের চামড়ায় আঁশ, পালক, কেশ, নখর ইত্যাদি নেই। তাই এই চামড়াকে **নগ্নত্বক** বলে। কুনোব্যাঙের সারা দেহ খসখসে চামড়ায় আবৃত। ব্যাঙের চামড়ায় দুটি স্তর আছে। বাইরের স্তরকে বলে **বহিস্ত্বক** আর ভিতরের স্তরকে বলে **অন্তস্ত্বক**। কয়েক সারি এপিথেলিয়াল কোষ দিয়ে বহিস্ত্বক গঠিত। বহিস্ত্বকের বাইরের এপিথেলিয়াল কোষগুলি পাতলা আঁশের মত এবং নিউক্লীয়সবিহীন। কিন্তু ভিতরের এপিথেলিয়াল কোষগুলি লম্বা ও বহুভুজ। বাইরের আঁশের মত কোষগুলির মাঝে মাঝে নির্মোচন ঘটে। নির্মোচনের পর ভিতরের এপিথেলিয়াল কোষ থেকে আবার নতুন করে কোষ সৃষ্টি হয়।

বহিস্ত্বক থেকে অন্তস্ত্বক পুরু। এই ত্বকে যোগকলায় আবদ্ধ হয়ে আছে অনৈচ্ছিক পেশী কোষ, রক্তনালী, নার্ভকোষ, রঙ্গককোষ ও গ্রন্থি। এই ত্বকের উপরিভাগে রঙ্গক কোষগুলির স্থান পরিবর্তনের ফলে দেহের বর্ণের পরিবর্তন ঘটে। এই স্তরের গ্রন্থিগুলি দেহের বাইরের চামড়ায় গুটির সৃষ্টি করে। এই গুটিপথে কোষ থেকে ক্ষরণজাত পদার্থ নির্গত হয়। ব্যাঙের ত্বকের প্রধান কাজ হল দেহের ভিতরের কোমল অংশকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করা। আবার এই

ত্বক বাড়তি শ্বাসযন্ত্র হিসাবে শ্বসনে সহায়তা করে। ত্বকের মাধ্যমেই ব্যাঙ জল শোষণ করে।

ব্যাঙের মত মানুষের ত্বক কিন্তু নগ্ন নয়। মসৃণ ত্বক প্রায় সম্পূর্ণভাবে চুলে ঢাকা। চুলের গোড়ায় অবস্থিত সেবেসাস (Sebaceous gland) নামে গ্রন্থি থেকে নির্গত রস চুলকে তৈলাক্ত রাখে। এছাড়া মানুষের ত্বকে অসংখ্য স্বেদ-গ্রন্থি (Sweat gland) আছে। ঐ স্বেদগ্রন্থির মধ্যে দিয়ে দেহের বহু আবর্জনা ঘামরূপে নির্গত হয়। তবে ব্যাঙের মত ঐ ত্বক দিয়ে শ্বসন বা শোষণ কাজ চলে না।



চিত্র নং ৪১—মানুষের ত্বকীয় স্বেদগ্রন্থি

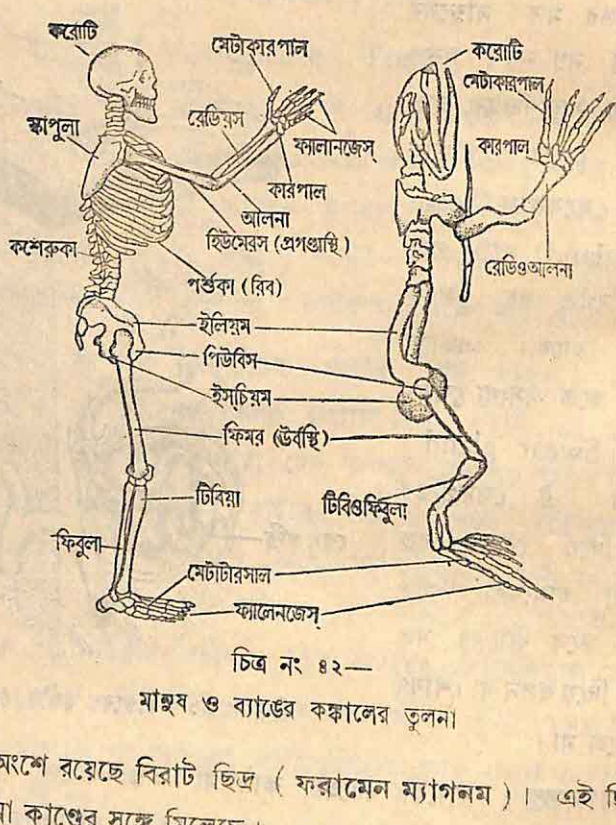
কঙ্কালতন্ত্র : ব্যাঙের দেহের কাঠামো অন্তঃকঙ্কালে গঠিত। এই অন্তঃকঙ্কালকে দুভাগে ভাগ করা হয়। (ক) **আক্ষিক কঙ্কাল** ও (খ) উপাক্ষিক কঙ্কাল।

আক্ষিক কঙ্কাল (Axial skeleton)

করোটি (Skull) ও **মেরুদণ্ড** (Vertebral column) নিয়ে আক্ষিক কঙ্কাল গঠিত।

করোটি : আক্ষিক কঙ্কালের সামনের অংশকে **করোটি** বলে। করোটির প্রধান অংশের অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা। এই অংশে মস্তিষ্ক থাকে। করোটির এই অংশকে করোটিক (Cranium) বলে। করোটিকের ছাদ একজোড়া পাতলা অস্থি দিয়ে গড়া। এর তল বা মেঝের অংশে ছোরার

মত দেখতে একটি অস্থি আছে। করোটিকের সামনের অংশে ছাদের অস্থি দুটিতে আবৃত হয়ে আছে একটি আংটির মত কার্টিলেজ। করোটিকের



চিত্র নং ৪২—
মানুষ ও ব্যাঙের কঙ্কালের তুলনা

পিছনের অংশে রয়েছে বিরাট ছিদ্র (ফরামেন ম্যাগনম)। এই ছিদ্রপথে মস্তিষ্ক সুষুম্না কাণ্ডের সঙ্গে মিলেছে।

করোটিকের সামনের অংশে যুক্ত রয়েছে দুটি নাসা ক্যাপসিউল, দুপাশে রয়েছে দুটি অক্ষিকোটর আর পিছনের অংশে দুটি শ্রুতি ক্যাপসিউল। নাসা ক্যাপসিউলে ঘ্রানেন্দ্রিয়, অক্ষিকোটরে চক্ষু আর শ্রুতি ক্যাপসিউলে শ্রবণেন্দ্রিয় অবস্থিত।

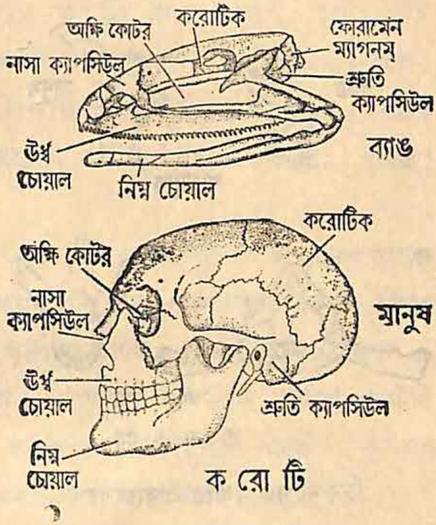
করোটিকের অঙ্কীয় পৃষ্ঠের বহিঃসীমার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশে রয়েছে ঊর্ধ্বচোয়াল। অর্থাৎ করোটিকের বহিঃসীমাই হল ঊর্ধ্বচোয়াল। তিনটি অস্থির সমন্বয়ে প্রতিদিকের ঊর্ধ্বচোয়াল অংশ গঠিত। নিম্নচোয়াল কিন্তু ঠিক ওইভাবে করোটিকের সঙ্গে মিশে থাকে না। ঊর্ধ্বচোয়ালের মত দুটি

সমান অংশ নিয়ে নিম্নচোয়াল গঠিত এবং এর প্রতি অংশে তিনটি বিশেষ প্রকার কার্টিলেজ আছে।

উর্ধ্বচোয়ালের দুধারের কোণের সঙ্গে নিম্নচোয়াল এমনভাবে যুক্ত রয়েছে যাতে খুব সহজেই নিম্ন-চোয়াল ওঠানামা করে।

কুনো ব্যাঙের চোয়ালে দাঁত নাই। সোনাব্যাঙের চোয়ালে দাঁত আছে। মানুষের চোয়ালেও বিভিন্ন ধরনের দাঁত আছে।

করোটির আর একটি অংশ হল হাওয়েড যন্ত্র (Hyoid apparatus)। ঐ যন্ত্র মুখগহ্বরের তল বা মেঝেতে অবস্থিত। এটি কার্টিলেজ দিয়ে গড়া চ্যাপ্টা আকৃতির অঙ্গ।



চিত্র নং ৪৩— ব্যাঙ (সোনা) ও মানুষের করোটির তুলনা

ব্যাঙের তুলনায় মানুষের করোটি অনেক ভারী ও সুদৃঢ়। আঠাশটি অস্থি দিয়ে এই করোটি গঠিত। মানুষের করোটিকের আয়তন ও গঠন যথেষ্ট বড়। করোটিকের পৃষ্ঠতলে যে এলোমেলো নানা ফাটলের মত দাগ দেখা যায় তাহলো বিভিন্ন অস্থির মিলনরেখা (Suture)। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দাগ অনেক মিলিয়ে যায়।

মেরুদণ্ড: দশটি অস্থিখণ্ড নিয়ে ব্যাঙের মেরুদণ্ড গঠিত। মেরুদণ্ডটি করোটির নিচে থেকে ধড়ের শেষ সীমা পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে পৃষ্ঠমধ্যরেখায় অবস্থিত। ব্যাঙের মেরুদণ্ডের প্রথম নয়টি খণ্ডকে **কশেরুকা** এবং দশম খণ্ডকে **ইউরোস্টাইল** বলে। কশেরুকাগুলি পরপর সজ্জিত থাকে। প্রথম কশেরুকাটি করোটির সহিত সংলগ্ন। প্রতিটি কশেরুকায় বড় গোলাকৃতি গহ্বর আছে। সুষুম্নাকাণ্ড এই গহ্বর মধ্যে বিস্তৃত। দ্বিতীয় থেকে অষ্টম পর্যন্ত কশেরুকাগুলি দেখতে একই রকম। তাই এদের **আদর্শ কশেরুকা**

(Typical Vertebra) বলে। প্রথমটি ছোট গোল, আংটির মত। ইউরোস্টাইল কিন্তু লম্বাটে আকৃতির।



চিত্র নং ৪৪—ব্যাঙ ও মানুষের কশেরুকার তুলনা

মানুষের মেরুদণ্ডে তেত্রিশটি কশেরুকা আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় কশেরুকার উপর মাথাটি এমনভাবে স্থাপিত যাতে সেটি সহজে সঞ্চালিত হয়। মানুষের মেরুদণ্ড পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ ঘাড়। ঘাড়ে সাতটি কশেরুকা আছে। দ্বিতীয় অংশ বুক। এই অংশে রয়েছে বারটি কশেরুকা। তৃতীয় অংশ উদর। উদর অংশ পাঁচটি কশেরুকায় গঠিত। চতুর্থ শ্রোণী অংশেও পাঁচটি কশেরুকা আছে। শ্রোণী অংশের কশেরুকাগুলি ত্রিকাস্থি বা সেক্রম (Sacrum) সৃষ্টি করেছে। মেরুদণ্ডের পঞ্চম অংশকে কক্সিক্স্ (Coccyx) বলে। এই অংশে রয়েছে চারটি কশেরুকা। মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলি সন্ধিবন্ধনী দিয়ে যুক্ত। তাই মেরুদণ্ডকে সহজেই ইচ্ছামত বাঁকানো যায়।

এছাড়া মানুষের বুকের বারোটি কশেরুকা থেকে বারোটি পর্শুকা বা পাঁজর বা রিব (Rib) বের হয়ে বক্ষ গহ্বরের অঙ্কদেশে অবস্থিত উরঃফলকের দিকে বিস্তৃত হয়েছে। মেরুদণ্ড, পর্শুকা ও উরঃফলক একত্রে বুকের খাঁচা সৃষ্টি করে। এই খাঁচায় হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস অবস্থিত।

উপাঙ্গিক কঙ্কাল (Appendicular skeleton)

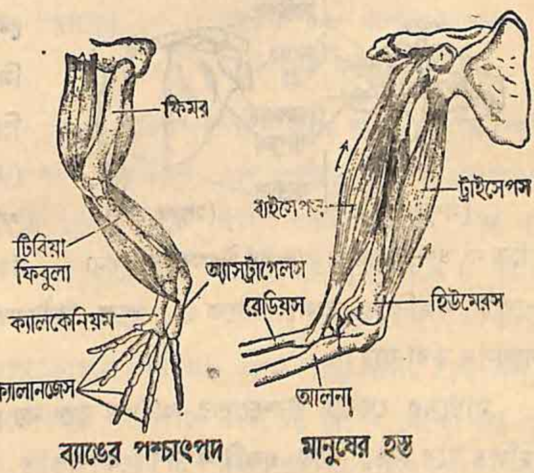
অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের কাঠামো এবং উরশ্চক্র ও শ্রোণীচক্র নিয়ে উপাঙ্গিক কঙ্কাল গঠিত।

অগ্রপদ (Forelimb) : ব্যাঙের অগ্রপদের প্রগণ্ড অংশের অস্থিকে প্রগণ্ডাস্থি বা হিউমেরাস (Humerus) বলে। অস্থিটি লম্বা। ব্যাঙের

পুরোবাহু অংশের লম্বা অস্থিটি রেডিয়স (Radius) ও আলনা (Ulna) নামে ছুটি অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। তাই একে রেডিও-আলনা (Radio-ulna) বলে। রেডিও-আলনার পরে কব্‌জি অংশে ছয়টি ছোট ছোট অস্থি ছুসারিতে সাজান থাকে। এগুলিকে কারপাল (Carpal) বলে। করতল অংশে আছে চারটি লম্বা মেটাকারপাল (Metacarpal)। প্রতি অঙ্গুলি অংশ কয়েকটি করে ফ্যালানজেস (Phalanges) নিয়ে গঠিত। (চিত্র নং ৪২ দেখ)।

মানুষের হাতের অস্থিসংস্থান ব্যাঙের অগ্রপদের মত। এখানেও প্রগণ্ড অংশে আছে প্রগণ্ডাস্থি। তবে পুরোবাহে রেডিয়স ও আলনা একত্রে মিশে একটি অস্থিতে পরিণত না হয়ে আলাদা থাকে। তাই একে রেডিয়স ও আলনা বলে (চিত্র নং ৪২ ও ৪৯ দেখ।) মানুষের কব্‌জি অংশে আটটি কারপাল ছুসারিতে সাজান থাকে। করতলে মেটাকারপাল পাঁচটি। আবার বৃদ্ধ অঙ্গুলীতে ছুটি, বাকি চারটিতে তিনটি করে ফ্যালানজেস আছে।

পশ্চাৎপদ (Hind limb) ঃ ব্যাঙের পশ্চাৎপদে উরু অংশের লম্বা অস্থিটিকে উর্বস্থি বা ফিমর (femur) বলে। উর্বস্থির পরেরটি টিবিয়া (Tibia) ও ফিবুলা (Fibula) নামে অস্থিদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত টিবিও-ফিবুলা (Tibio-Fibula) অস্থি। টিবিও-ফিবুলার পরে রয়েছে ছুসারি টারসাল (Tarsal) অস্থি। প্রথম সারিতে অ্যাসট্রাগেলস ক্যালকেনিয়ম (Astragalus calcanium) নামে ছুটি লম্বা অস্থি পরস্পরের সঙ্গে প্রতি প্রান্তে যুক্ত, কিন্তু তাদের মাঝে যথেষ্ট ফাঁক আছে। দ্বিতীয় সারিতে আছে



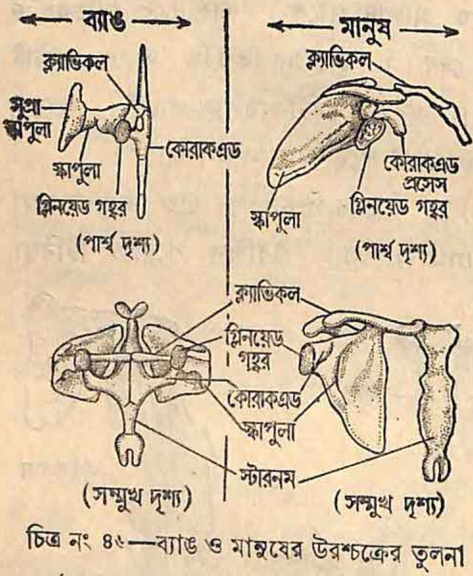
ব্যাঙের পশ্চাৎপদ মানুষের হস্ত

চিত্র নং ৪৫—

দুটি বা তিনটি ছোট ছোট অস্থি। চরণ অংশ **মেটাটারসাল** (Metatarsal) নামে পাঁচটি সরু অস্থি দিয়ে গঠিত। প্রতি অঙ্গুলি অংশে কয়েকটি ফ্যালানজেস আছে।

মানুষের পায়ের অস্থিসংস্থানও ব্যাঙের পশ্চাৎপদের মত। এখানে ফিমর বেশ লম্বা কিন্তু টিবিয়া ও ফিবুলা একত্রে না মিলে আলাদা থাকে। মানুষের টারসাল অস্থি সাতটি। মেটাটারসাল অংশে ব্যাঙের মতই পাঁচটি লম্বা অস্থি আছে। অঙ্গুলিতে দুটি থেকে তিনটি ফ্যালানজেস থাকে। (চিত্র নং ৪২ ও ৪৯ দেখ ।

উরশ্চক্র (Pectoral girdle) **:** ব্যাঙের ধড়কে বেষ্টন করে ধড়ের অগ্রভাগে যে অস্থি রয়েছে তাকে উরশ্চক্র বলে। দুটি সদৃশ অর্ধাংশ নিয়ে এটি গঠিত। প্রতি অর্ধাংশে **সুপ্রাস্কাপুলা** (Suprascapula), **স্কাপুলা** Scapula), **ক্ল্যাভিকল্** (Clavicle) ও **কোরাকএড** (Coracoid) অস্থি আছে। শেষের তিনটি অস্থির মিলনস্থলে প্রতি দিকে **গ্লিনয়েড গহ্বরের** (Glenoid cavity) সৃষ্টি হয়। এই গহ্বরে হিউমেরসের মাথাটি বল ও সকেট পদ্ধতিতে সংলগ্ন থাকে। ফলে হিউমেরসকে যে কোন দিকে সঞ্চালন করা যায়।



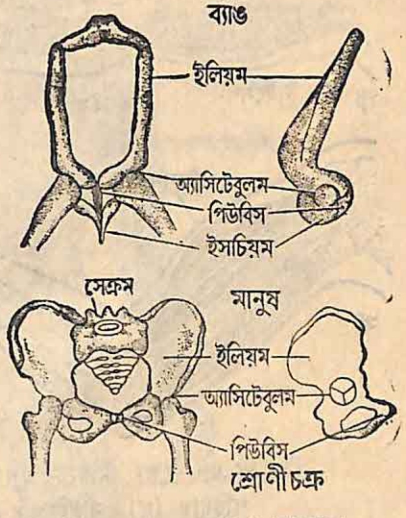
চিত্র নং ৪৬—ব্যাঙ ও মানুষের উরশ্চক্রের তুলনা

মানুষের ক্ষেত্রে উরশ্চক্রের অর্ধাংশ যুক্ত নয়। স্কাপুলা ও কোরাকএড মিলিত হয়ে উভয় দিকে একটি করে ত্রিকোণাকৃতি অস্থি গড়ে তুলেছে এবং প্রতিদিকে গ্লিনয়েড গহ্বরে সেই দিকের হিউমেরসের মাথা স্থাপিত।

শ্রোণীচক্র (Pelvic girdle) : দেহের পশ্চাৎ অংশের অস্থিচক্রকে শ্রোণীচক্র বলে। ব্যাঙের শ্রোণীচক্রের আকৃতি ইংরেজী 'V'-এর মত।

শ্রোণীচক্রও দুটি সদৃশ অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত। প্রতি অর্ধাংশে ইলিয়ম (Ilium), ইস্‌চিয়ম (Ischium), পিউবিস (Pubis) নামে তিনটি অস্থি আছে। পশ্চাৎদিকে এই তিনটি অস্থি মিলিত হয়ে উভয় পাশে অ্যাসিটেবুলম (Acetabulum) নামে গহ্বরের সৃষ্টি করেছে। এই গহ্বরে ফিমরের মাথাটি বল ও সকেট পদ্ধতিতে স্থাপিত হওয়ায় পশ্চাৎপদ যে কোন দিকে সঞ্চালন করা সম্ভব।

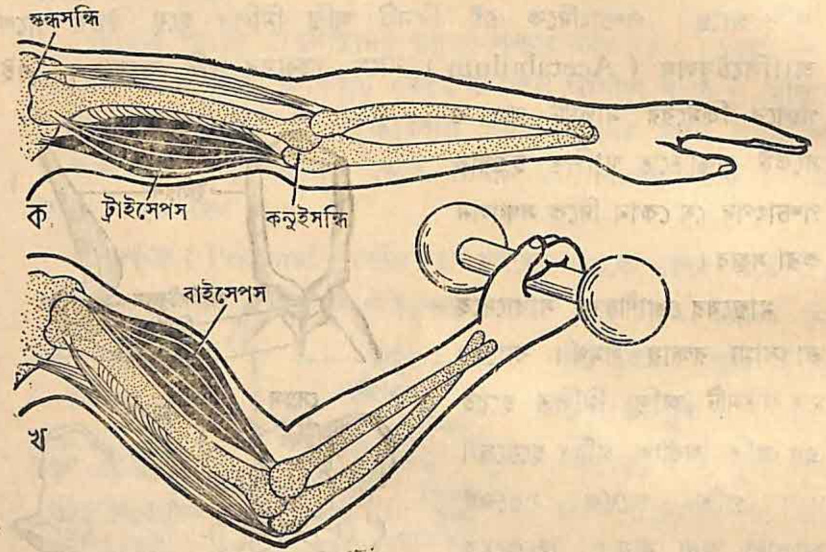
মানুষের শ্রোণীচক্র সারাদেহে ভারসাম্য রক্ষায় সমর্থ। ব্যাঙের মত তিনটি অস্থি মিলিত হয়েই এর প্রতি অর্ধাংশ গঠিত হয়েছে। তবে প্রতি অর্ধেক সহজেই আলাদা করা যায়। সেক্রমের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রোণীচক্র মানুষের পশ্চাৎ অংশে বড় গহ্বরের সৃষ্টি করে।



চিত্র নং ৪৭—ব্যাঙ ও মানুষের শ্রোণীচক্রের তুলনা

পেশীতন্ত্র ঃ ব্যাঙের দেহের অধিকাংশ অংশ জুড়ে আছে কঙ্কাল পেশী। এদের দেহের কঙ্কালপেশীর সংখ্যা অনেক। এই পেশীর তন্তুগুলি যোগকলায় আবদ্ধ। সাধারণতঃ প্রতি পেশীর এক প্রান্ত একটি অস্থির সঙ্গে এবং অপরপ্রান্ত অন্য অস্থি বা দেহের অন্য অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বিভিন্ন পেশীর সংকোচন বিভিন্ন অঙ্গের আন্দোলন ঘটায়। এক পেশীর সংকোচনে যে অঙ্গ ওঠে অন্য পেশীর সংকোচনে সেই অঙ্গ নামে। বাহু-সংলগ্ন বাইসেপ্‌স্‌ (Biceps) পেশীর সংকোচনে পুরোবাহু প্রগণ্ডের দিকে বেঁকে যায় এবং ট্রাইসেপ্‌স্‌ (Triceps) পেশী সংকুচিত হলেই বাঁকা পুরোবাহু সোজা হয়। তাই বাইসেপ্‌স্‌ পেশীকে ফ্লেকসর (Flexor) এবং ট্রাইসেপ্‌স্‌কে এক্সটেনসর (Extensor) বলে। আবার যে পেশীর সংকোচনে কোন অংশ নিম্নগামী হয় তাকে ডিপ্রেসর (Depressor) এবং তার বিপরীত

ধর্মী পেশীকে **লিভাটর** (Levator) বলে। এইরূপ কাজের উপর ভিত্তি করে ব্যাঙের পেশীকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়। মানুষের দেহেও এইরূপ



চিত্র নং ৪৮—(ক) মানুষের হাতের ট্রাইসেপ্‌স্‌ পেশীর সংকোচনের পরিণাম (খ) বাইসেপ্‌স্‌ পেশীর সংকোচনের পরিণাম

বিভিন্নধর্মী পেশীর* সমাবেশ ঘটেছে (চিত্র নং ৪৯ দেখ)। মাথা, ঘাড়, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গেই পেশীর সংখ্যা বেশী।

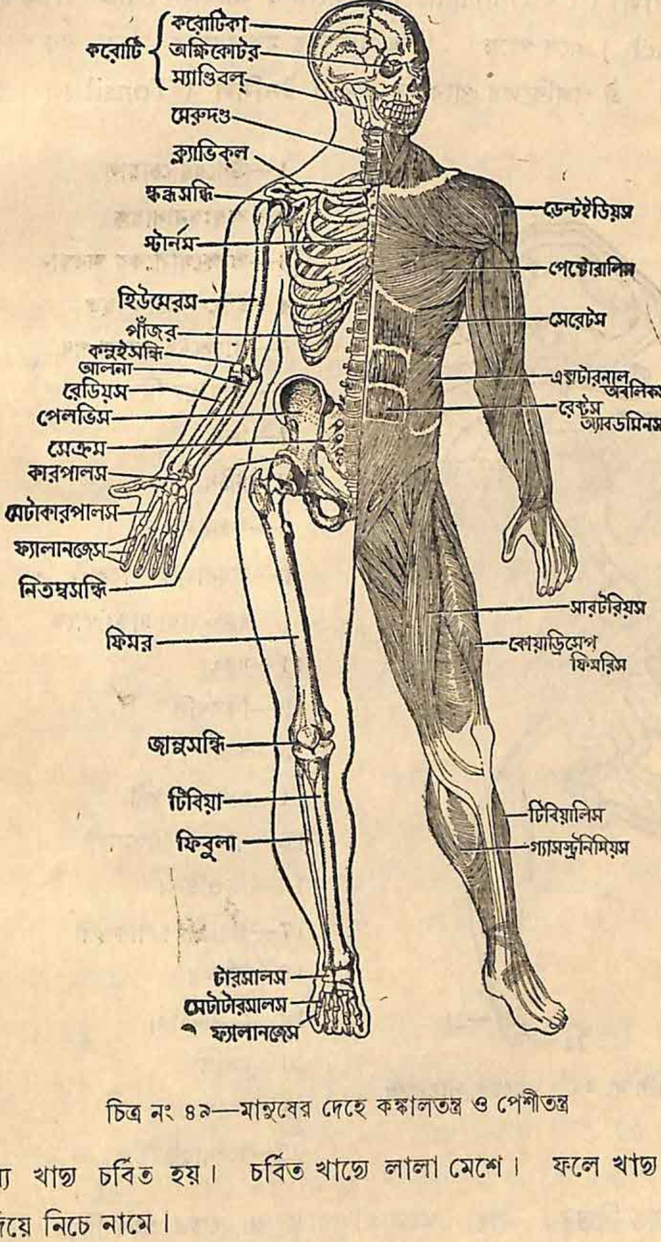
পাচনতন্ত্র : পৌষ্টিক নালী এবং পৌষ্টিক গ্রন্থিসমূহ এই তন্ত্রের অন্তর্গত।

পৌষ্টিক নালী : পেশী দিয়ে গড়া এই দীর্ঘ নালী ব্যাঙের মুখ থেকে অবসারণী ছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। বিভিন্ন অংশে এই নলের আকৃতি ও কার্যকলাপ ভিন্ন। মাথার সম্মুখ প্রান্তে রয়েছে বিস্তৃত মুখ। মুখের পরের অংশই প্রশস্ত **মুখবিবর** (Buccal cavity)। মুখবিবর চোয়াল দিয়ে ঘেরা। মুখবিবরের মেঝেয় মাংসল জিব আছে। **ব্যাঙের জিবের সম্মুখভাগ মেঝের সঙ্গে যুক্ত।** ব্যাঙের মুখবিবরে **লালাগ্রন্থি** (Salivary glands) নেই।

মানুষের মুখবিবর ঘিরে যে চোয়াল আছে তাতে যোলটি করে মোট বত্রিশটি দাঁত আছে। **মানুষের জিবের পশ্চাৎভাগ মেঝের সঙ্গে যুক্ত।**

* প্রাণীর চলন ও গমন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন পেশীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পরের ক্লাসে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে।

মানুষের মুখবিবরে তিনজোড়া লালাগ্রন্থি আছে। দাঁত ও জিবের

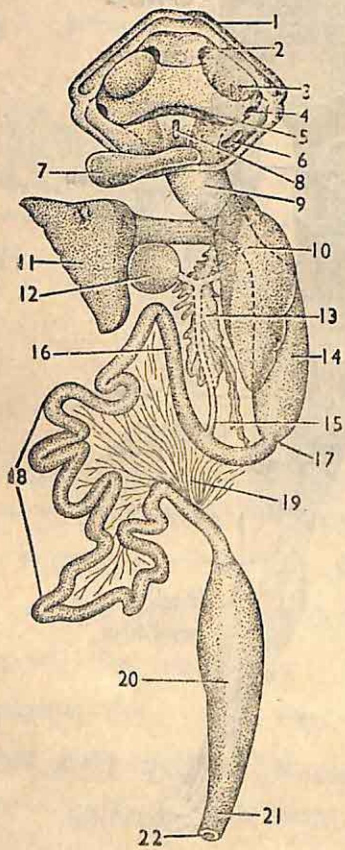


চিত্র নং ৪৯—মানুষের দেহে কঙ্কালতন্ত্র ও পেশীতন্ত্র

সাহায্যে খাদ্য চর্বিত হয়। চর্বিত খাদ্যে লালা মেশে। ফলে খাদ্য সহজেই গলা দিয়ে নিচে নামে।

মুখবিবরের পরের অংশ গলবিল (Pharynx)। ব্যাঙের গলবিল

অংশ সুনির্দিষ্ট নয়। মুখবিবর সরু হয়ে যে নালীতে পরিণত হয় তাকে বলে **অন্ননালী** (Oesophagus)। সংক্ষিপ্ত অন্ননালী সোজা **পাকস্থলীতে** (Stomach) এসে পড়ে। কিন্তু মানুষের মুখবিবরের পরে প্রকৃত গলবিল অবস্থিত। ঐ গলবিলের প্রাকারে রয়েছে **টনসিল** (Tonsil)। গলবিল



চিত্র নং ৫০—ব্যাঙের পাচনতন্ত্র

1—উপরের চোয়াল
2—অন্তঃস্থনাসারন্ধ্র
3—অক্ষিগোলকের অবস্থান
4—ইউস্টেসিয়ান ছিদ্র
5—গালেটের প্রবেশ পথ
6—স্বরথলির ছিদ্র
7—জিব
8 গ্লটিস
9—অন্ননালী
10—অন্ননালীর পরবর্তী এই অংশটি যকৃৎ-দ্বারা ঢাকা থাকে
11—যকৃৎ
12—পিত্তথলি
13—অগ্ন্যাশয়
14—হার্দ-পাকস্থলী
15—সাধারণ পিত্তনালী
16—ডিওডিনম
17—প্রণালিকা-পাকস্থলী
18—ইলিয়ম
19—মেসেনটারী
20—মলাশয়
21 - অবসারণী
22—অবসারণী ছিদ্র

অন্ননালীতে বিস্তৃত। লম্বা অন্ননালী ঘাড় ও বুকের অংশ দিয়ে নেমে এসে মধ্যচ্ছদা ভেদ করে পাকস্থলীতে পৌঁছায়।

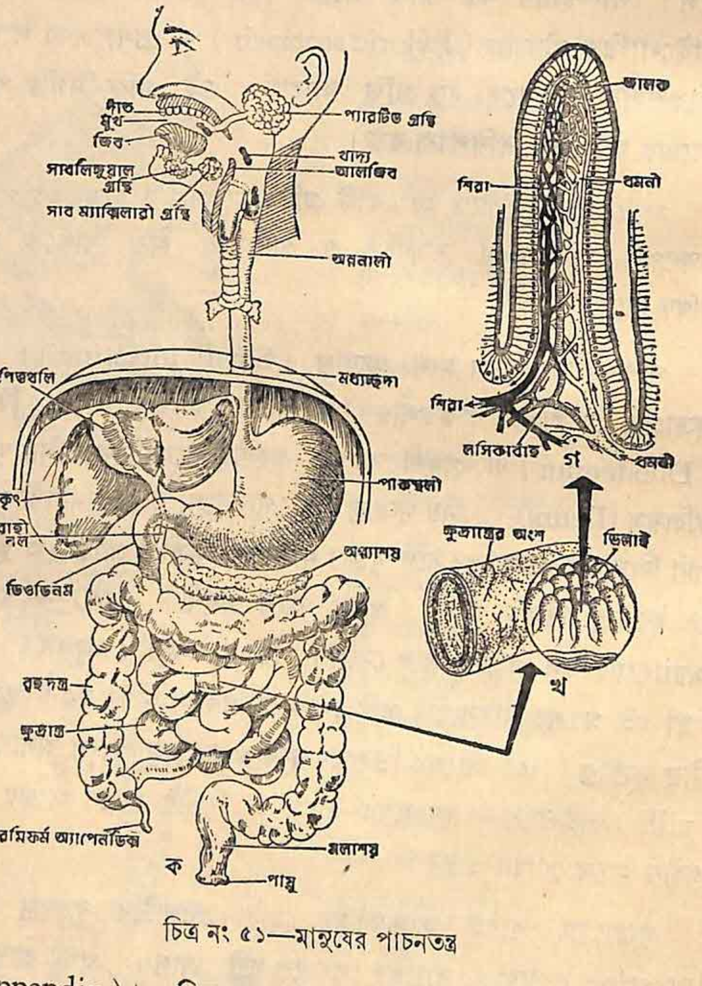
পাকস্থলী স্ফীত থলির মত অংশ। ব্যাঙের পাকস্থলী দেহগহ্বরের একটু বামদিক ঘেঁসে রয়েছে। পাকস্থলীর যে অংশে অন্ননালী মুক্ত সেই অংশকে কার্ডিঅ্যাক স্টম্যাক (Cardiac stomach) বা হার্দ-পাকস্থলী বলে। পাকস্থলীর অন্য প্রান্ত অন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। পাকস্থলীর ঐ অংশ পাইলোরিক স্টম্যাক (Pyloric stomach) বা প্রণালিকা পাকস্থলী। পাকস্থলীর প্রাকারে বহু গ্রন্থি আছে। ওই গ্রন্থি-নির্গত পাকরসে খাদ্যের আংশিক পরিপাক হয়।

মানুষের পাকস্থলীতে ৩৫ কোটি গ্রন্থি আছে। তাছাড়া এই পাকস্থলীর শক্তপেশী পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে খাদ্যকে দলিত ও মথিত করে।

পাকস্থলীর পরের অংশ ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine)। ব্যাঙের ক্ষুদ্রান্ত্রের যে অংশ পাকস্থলীর সমান্তরালে অবস্থিত তাকে ডিওডিনম (Duodenum) বা গ্রহণী বলে। গ্রহণীর পরের অংশ নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র বা ইলিয়ম (Ileum)। নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র লম্বা, প্যাঁচালো ও মেসেনটারী নামে স্বচ্ছ পর্দা দিয়ে দেহ প্রাকারের সঙ্গে যুক্ত। মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় ২৩ ফুট লম্বা। ঐ ক্ষুদ্রান্ত্রে তিনটি অংশ। প্রথম অংশ গ্রহণী। এই অংশে যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের রস খাদ্যের সঙ্গে মেশে। দ্বিতীয় অংশ জেজুনম। ১০ ফুট লম্বা এই অংশের গাত্রসংশ্লিষ্ট গ্রন্থি থেকে আন্ত্রিকরস নির্গত হয়। তৃতীয় অংশ নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র। এই অংশের ভিতরের কুঞ্চিতগাত্র অঙ্গুলিসদৃশ অসংখ্য ভিল্লাই (villi) সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে খাদ্যের পাচন ও তৃতীয় অংশে শোষণ ঘটে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের পরেই অপেক্ষাকৃত মোটা অংশটিকে বৃহদন্ত্র (Large intestine) বলে। ব্যাঙের বৃহদন্ত্রে দুটি অংশ। প্রথম অংশ রেক্টম (Rectum) বা মলাশয়। এই অংশে অপাচ্য পদার্থ জমা হয় এবং মলে পরিণত হয়। বৃহদন্ত্রের শেষ অংশকে বলে অবসারণী বা ক্লোএকা (Cloaca) মল-মূত্র, ডিম্বাণু, শুক্রাণু প্রভৃতি এই প্রকোষ্ঠে বাহিত হয় এবং দেহের শেষ প্রান্তে অবস্থিত অবসারণী ছিদ্রপথে বাইরে বেরিয়ে আসে।

মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে বন্ধ থলি আকৃতির যে অঙ্গটি আছে তাকে সিকম (Caecum) বলে। সিকম থেকে আঙুলের মত যে অংশটি বের হয়েছে তাকে বলে ভারমিফর্ম অ্যাপেনডিক্স (Vermi-



চিত্র নং ৫১—মানুষের পাচনতন্ত্র

form appendix)। সিকমের পরের অংশ কোলন (Colon)। কোলনের পরেই রেক্টম। মানুষের ক্লোএকা নেই। রেক্টম পায়ুতে এসে মুক্ত হয়েছে।

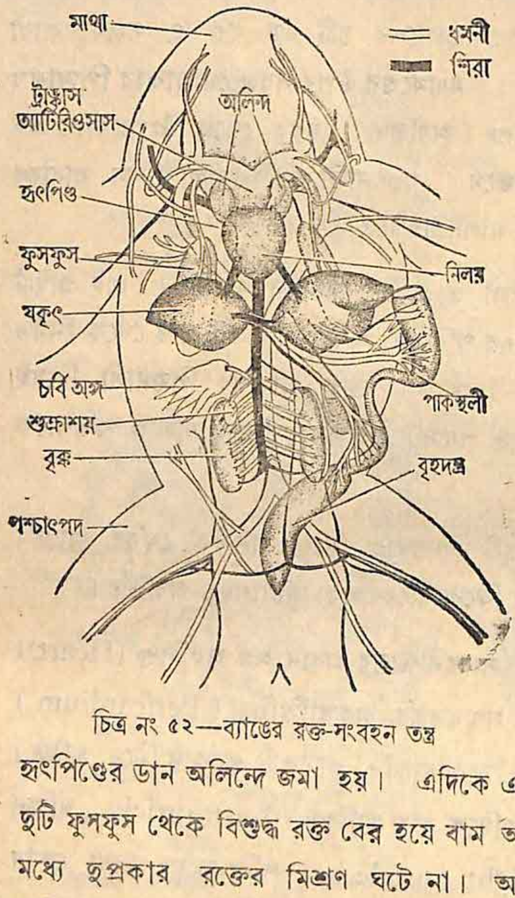
পরিপাকগ্রন্থি ঃ পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের দেহস্তরে অবস্থিত সূক্ষ্ম গ্রন্থি ছাড়াও পাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তুটি বড় গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি তুটি হ'ল **যকৃৎ** (Liver) ও **অগ্ন্যাশয়** (Pancreas)। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের তুপাশে বাদামী রংয়ের যকৃৎ অবস্থিত। তুপাশের তুটি বড় খণ্ড ও সংযোগকারী মধ্যখণ্ড নিয়ে ঐ যকৃৎ গঠিত। মধ্যখণ্ডের উপর সবুজ গোলাকার **পিত্তাশয়** বা **পিত্তথলি** (Gall bladder) অবস্থিত। যকৃৎ থেকে উৎপন্ন পিত্ত এই থলিতে এসে সাময়িকভাবে জমে। যকৃৎনালী ও পিত্তনালী মিলে সাধারণ পিত্তনালী সৃষ্টি করে। সেই নালী গ্রহণীতে মুক্ত হয়।

ব্যাঙের **অগ্ন্যাশয়** পাকস্থলী ও গ্রহণীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই গ্রন্থিটি লম্বা ফিকে হলুদ রংয়ের। এর পরিধিও অসমান। এই গ্রন্থি থেকে নির্গত নালী সাধারণ পিত্তনালীতে মিশেছে। তাই সাধারণ পিত্তনালী দিয়েই পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয়রস গ্রহণীতে আসে। এই রস যুগ্মভাবে খাদ্যকে পরিপাকে সহায়তা করে।

মানুষের বৃহৎ যকৃৎ গ্রন্থিটি মধ্যচ্ছদার নিচে ডানদিক ঘেঁসে আছে। পাকস্থলী ও গ্রহণীর মধ্যস্থলে ফিকে রংয়ের লম্বা অগ্ন্যাশয়ও অবস্থিত।

রক্ত-সংবহন তন্ত্র ঃ রক্ত-সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ **হৃৎপিণ্ড** (Heart)। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড দেহ গহ্বরের সম্মুখভাবে **হৃদ্ধরাঝিল্লির** (Pericardium) মধ্যে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডটি ত্রিকোণাকৃতি, কয়েকটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। উপরিভাগে চওড়া অংশের বামদিকে **বাম অলিন্দ** (Left auricle), দক্ষিণ দিকে **দক্ষিণ অলিন্দ** (Right auricle)। অলিন্দদ্বয়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। দক্ষিণ অলিন্দ আকৃতিতে বাম অলিন্দ থেকে বড়। অলিন্দদ্বয়ের নিচে এক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট **নিলয়** (Ventricle) অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে পাতলা প্রাকারবিশিষ্ট ত্রিভুজাকৃতি যে প্রকোষ্ঠটি আছে তাকে বলে **সাইনস ভেনোসস** (Sinus venosus)। হৃৎপিণ্ডের অঙ্কদেশে যে পুরু প্রাকারবিশিষ্ট নলের মত অংশ রয়েছে তার নাম **কোনস আর্টিরিওসস** (Conus arteriosus)।

হৃৎপিণ্ডের অলিন্দদ্বয় ও সাইনস ভেনোসস রক্ত গ্রাহকের কাজ করে। নিলয় ও কোনস আর্টিরিওসস হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তকে ধমনীপথে প্রেরণ করে।



চিত্র নং ৫২—ব্যাঙের রক্ত-সংবহন তন্ত্র

সাইনস ভেনোসসের তিন কোণে যে তিনটি মোটা রক্তবাহ আছে সেগুলিকে মহাশিরা বলে। বিভিন্ন শিরা মিলিত হয়ে এই তিনটি মহাশিরায় পরিণত হয়েছে। এই তিন মহাশিরা দিয়ে রক্ত সাইনস ভেনোসসে ফিরে আসে। এই রক্ত অশুদ্ধ। সংকোচনের ফলে সাইনস ভেনোসস থেকে এই অশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে জমা হয়। এদিকে একই সময়ে ফুসফুস শিরাপথে দুটি ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত বের হয়ে বাম অলিন্দে আসে। অলিন্দদ্বয়ের মধ্যে দুপ্রকার রক্তের মিশ্রণ ঘটে না। অলিন্দদ্বয় একত্রে সংকুচিত হলে অলিন্দদ্বয় থেকে রক্ত একটিমাত্র ছিদ্র পথে নিলয়ে আসে। অলিন্দদ্বয় ঐ একটিমাত্র পথে নিলয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে।

নিলয়ে আছে একটিমাত্র প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠের প্রাকার পুরু এবং এর ভিতর পেশী উঁচু উঁচু ভাবে সজ্জিত হয়ে নিলয়ের গহ্বরে প্রচুর খাঁজের সৃষ্টি করে। নিলয়ের বামদিকের খাঁজগুলিতে বিশুদ্ধ রক্ত আর দক্ষিণ দিকের খাঁজগুলিতে অশুদ্ধ রক্ত জমা হয়। **নিলয়ের মধ্য অংশে উভয় প্রকার**

রক্তের মিশ্রণ ঘটে। নিলয়ের দক্ষিণদিক থেকে কোনাস আর্টিরিওসস বের হয়। কোনস আর্টিরিওসস অগ্রসর হয়ে মূল ধমনী ট্রাঙ্কাস আর্টিরিওসসে পড়ে। ট্রাঙ্কাস আর্টিরিওসস দক্ষিণ ও বাম অংশে বিভক্ত হয়ে প্রতি অংশ থেকে ক্যারটিড (Carotid), সিসটেমিক (Systemic), ও পালমোকিউটেনিয়স (Pulmocutaneous) নামে তিনটি প্রধান মহাধমনী গঠন করে।

নিলয়ের সংকোচনের ফলে নিলয়ের দক্ষিণ দিক থেকে অশুদ্ধ রক্ত প্রথমে কোনসে প্রবেশ করে এবং পালমোকিউটেনিয়স মহাধমনী পথে ফুসফুসে ও চামড়ায় চলে যায়। নিলয় আরও সংকুচিত হলে নিলয়ের মধ্যভাগ থেকে মিশ্রিত রক্ত কোনসে প্রবেশ করে সিসটেমিক মহাধমনীতে আসে এবং নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে দিয়ে দেহের পিছনের অংশে প্রবাহিত হয়। সব শেষে নিলয়ের বাম দিক থেকে বিশুদ্ধ রক্ত কোনসে আসে এবং ক্যারটিড মহাধমনীতে প্রবেশ করে। ক্যারটিড মহাধমনী থেকে সেই বিশুদ্ধ রক্ত নানা শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে মাথার বিভিন্ন অংশে চলে যায়।

আবার ফুসফুস বাদে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত বিভিন্ন শিরার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে তিনটি মহাশিরায় সঞ্চিত হয় এবং পূর্ব-বর্ণিত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

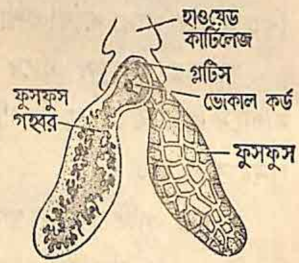
রক্তের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে কপাটক। কয়েকটি কপাটক থাকায় রক্ত বিপরীত পথে প্রবাহিত হতে পারে না।

মানুষের হৃৎপিণ্ড দুই ফুসফুসের মধ্যবর্তী স্থানে মধ্যচ্ছদার (Diaphragm)-র ঠিক উপরে অবস্থিত। এই হৃৎপিণ্ডে চারিটি প্রকোষ্ঠ। বামদিকে বাম অলিন্দ ও তার নিচে বাম নিলয় এবং দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ অলিন্দ ও তার নিচে দক্ষিণ নিলয় অবস্থিত। বাম অলিন্দ বাম নিলয়ের সঙ্গে এবং দক্ষিণ অলিন্দ দক্ষিণ নিলয়ের সঙ্গে ছিদ্রপথে যুক্ত। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের বাম দিকের প্রকোষ্ঠ দুটির সঙ্গে দক্ষিণ দিকের প্রকোষ্ঠ দুটির কোন যোগাযোগ নেই। ফলে মানুষের হৃৎপিণ্ডে বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ রক্তের মিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে না। উত্তরা মহাশিরা দক্ষিণ অলিন্দের সঙ্গে এবং

চারিটি ফুসফুস-শিরা বাম অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বাম নিলয় একটি মাত্র মহাধমনীর আর দক্ষিণ নিলয় ফুসফুস-ধমনীর সঙ্গে যুক্ত। তাই মানুষের সংবহনতন্ত্রে বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ রক্তের মিশ্রণ ঘটে না।

হৃৎপিণ্ড থেকে যে নালীপথে রক্ত বাহিত হয় তাকে ধমনী (Artery) বলে। ধমনী শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শাখাধমনী গঠন করে। শাখাধমনী আরও সূক্ষ্ম হয়ে দেহের বিবিধ কলায় যায় এবং জালের ন্যায় কোষকে ঘিরে থাকে। এই জালকেই জালক (Capillary) বলে। জালকের মাধ্যমে দেহকোষ ও রক্তের মধ্যে খাদ্য ও গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটে। আবার জালকের অপর প্রান্ত একত্র হয়ে সূক্ষ্ম উপশিরা গঠন করে। উপশিরাগুলি মিলিত হয়ে শিরা ও শিরাগুলি মিলিত হয়ে মহাশিরায় পরিণত হয়। মহাশিরা পথে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

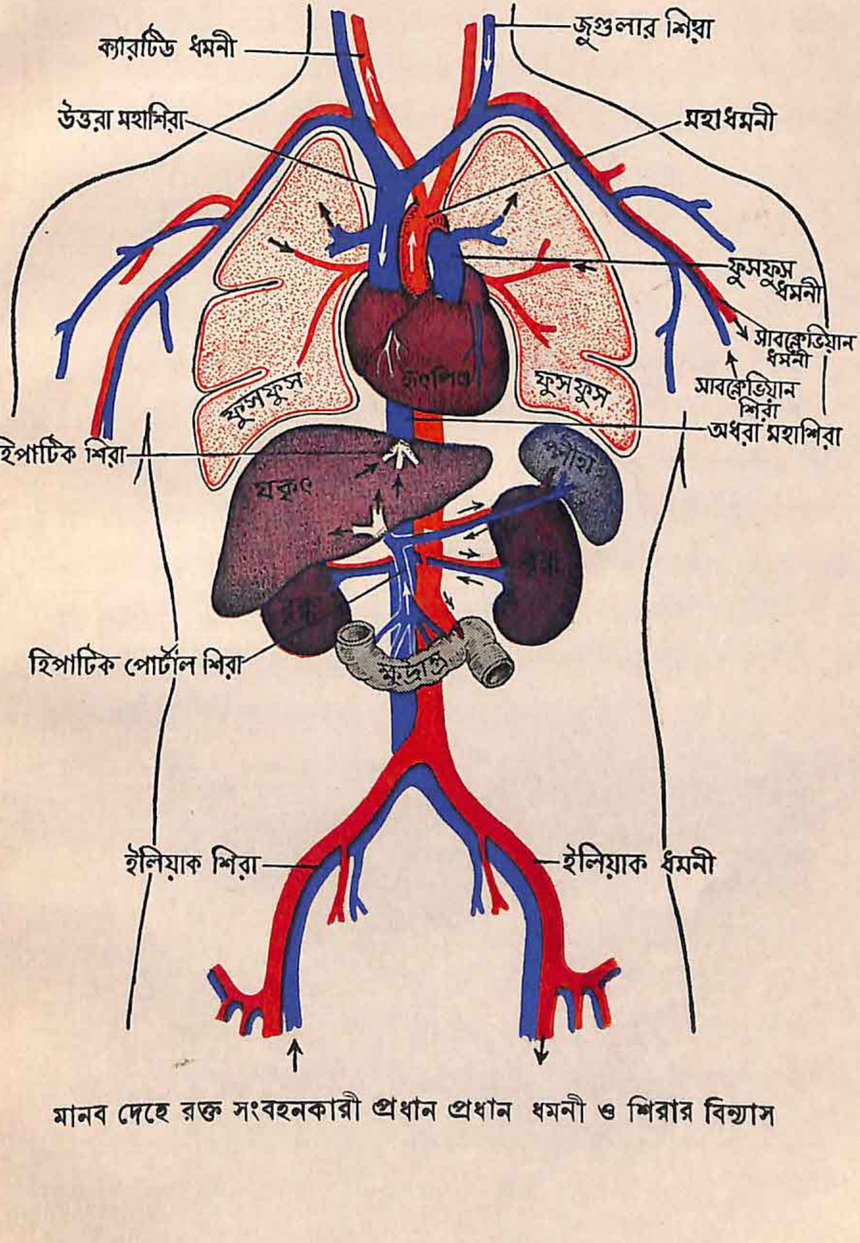
শ্বাসতন্ত্র : পরিণত ব্যাঙের ফুসফুস, মুখবিবর ও গলবিলের শ্লেষ্মাঝিল্লি ও চর্ম শ্বাসতন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে সর্বপ্রধান শ্বাসযন্ত্র হল ফুসফুস।



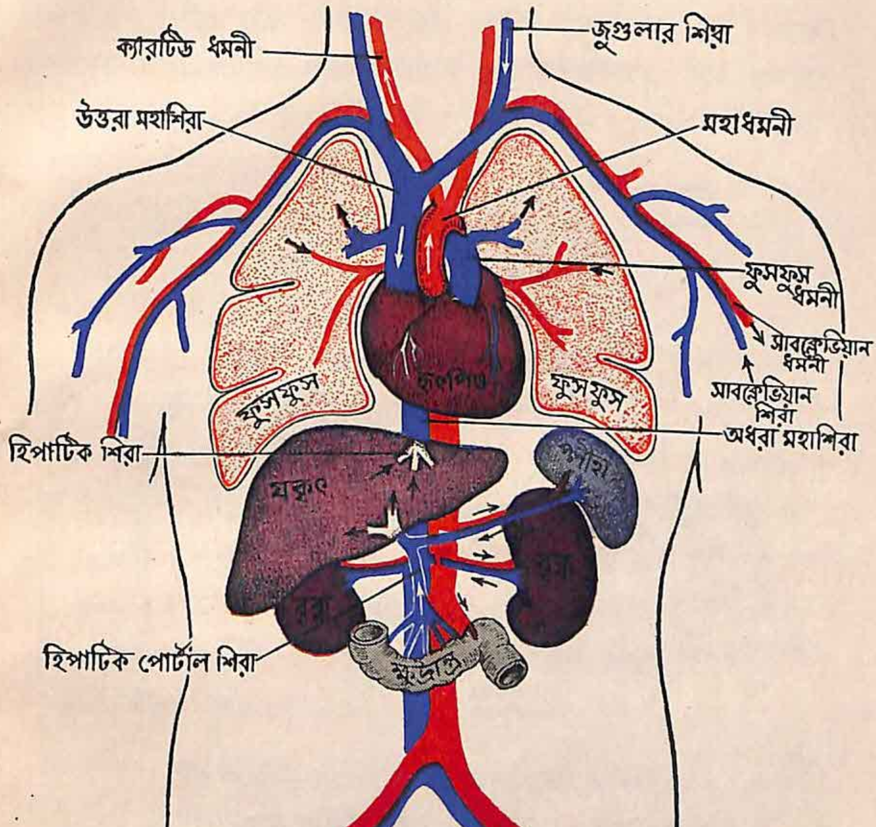
চিত্র নং ৫৩—
ব্যাঙের শ্বাসতন্ত্র

ব্যাঙের ফুসফুস দুটি পাতলা প্রাকার-বিশিষ্ট স্পঞ্জসদৃশ থলি। হৃৎপিণ্ডের উভয় পাশে একটি করে ফুসফুস আছে। ফুসফুসের রং হালকা লাল। ফুসফুসের ভিতরের পর্দা ভাঁজ হয়ে অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত অসংখ্য ছোট ছোট মুক্তদ্বার কুটরীর সৃষ্টি করে। এগুলিকে বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাই (Alveoli বলে। ফুসফুস-ধমনীর সূক্ষ্ম শাখা প্রতি অ্যালভিওলাই-এ প্রবেশ কোরে জালক সৃষ্টি করে এবং সেখানে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটে।

প্রতি ফুসফুসের অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে সংক্ষিপ্ত ক্লোমশাখা বা ব্রংকস নালীর সৃষ্টি করে। ব্রংকস নালী দুটি মিলিত হয়ে ল্যারিংগো-ট্রাকিয়াল (Laringo-tracheal) প্রকোষ্ঠে যায়। এই প্রকোষ্ঠ গ্লটিস (Glottis) নামে

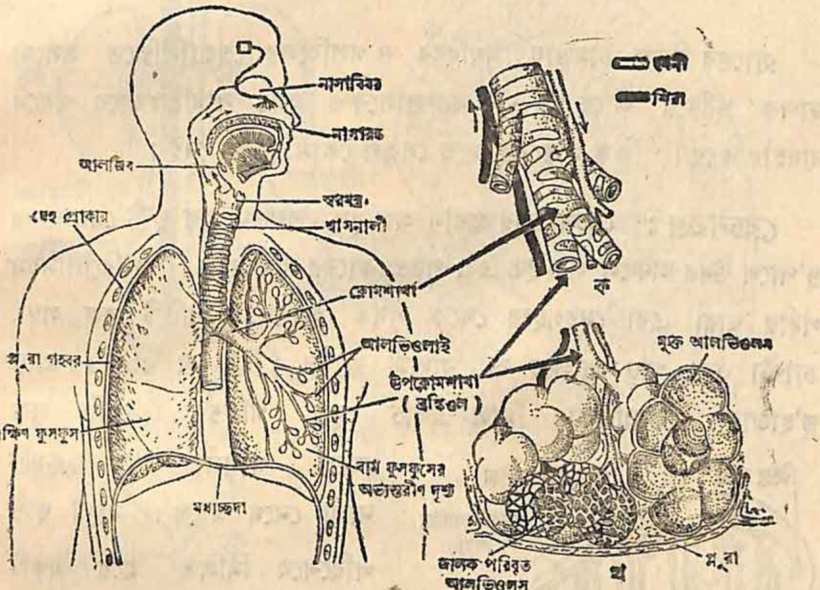


মানব দেহে রক্ত সংবহনকারী প্রধান প্রধান ধমনী ও শিরার বিন্যাস



মানব দেহে রক্ত সংবহনকারী প্রধান প্রধান ধমনী ও শিরার বিন্যাস

ছিদ্রপথে মুখবিবরে মুক্ত। আবার ব্যাঙের সম্মুখভাগে অবস্থিত নাসারন্ধ্রের ছিদ্র দু'টি অন্তঃনাসারন্ধ্র পথে মুখবিবরের সহিত যুক্ত। প্রশ্বাসের সময় বাইরের বায়ু এইপথে প্রথমে মুখবিবরে, পরে ফুসফুসে



চিত্র নং ৫৪—মানুষের শ্বাসযন্ত্র ও তৎসম্পর্কিত অঙ্গাদি
ক. ক্লোমশাখা এবং তৎসংলগ্ন শিরা ও ধমনী। খ. পরিবর্ধিত উপক্লোমশাখা ও আলভিওলস।

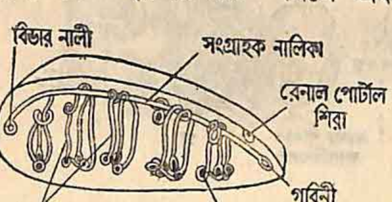
পৌঁছায় এবং নিঃশ্বাসের সময় ঐ বায়ু ফুসফুস থেকে প্রথমে মুখবিবরে আসে পরে নাসারন্ধ্রপথে বের হয়ে যায়।

মানুষের দেহের ফুসফুস দু'টিকে আবৃত করে দু'স্তর বিশিষ্ট একটি আর্দ্র মসৃণ আবরণী কলার ঝিল্লি আছে। এই ঝিল্লিকে প্লুরা (Pleura) বলে। ব্যাঙের প্লুরা নেই। এছাড়া মানুষের নাসাবিবর চুলে ভরা। এই চুলের মধ্যে বায়ুর ধূলিকণা ধরা পড়ে। ফলে শোধিত বাতাস গলবিলে আসে। গলবিল একটি সাধারন প্রকোষ্ঠ। এখানে খাদ্য ও বায়ু প্রবেশ করে। গলবিল থেকে

খাদ্য অন্ননালীতে যায় আর বায়ু **শ্বাসনালীতে** আসে। শ্বাসনালী দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে দু'টি ব্রংকসে (ক্লোমশাখায়) পরিণত হয় এবং ফুসফুসে এসে পড়ে (চিত্র নং ৫৪ দেখ)। নাসারন্ধ্র ছাড়া সমস্ত পথ শ্লেষ্মাঝিল্লিতে ঢাকা থাকায় বায়ু পুরোপুরি শোধিত হয়ে ফুসফুসে আসে।

ব্যাঙের ভিজে চামড়ায়, মুখবিবর ও গলবিলের শ্লেষ্মাঝিল্লিতে অসংখ্য জালক ছড়িয়ে আছে। এই অঙ্গগুলিকেও ব্যাঙ সাময়িকভাবে শ্বসনে ব্যবহার করে। কিন্তু মানুষের দেহে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নেই।

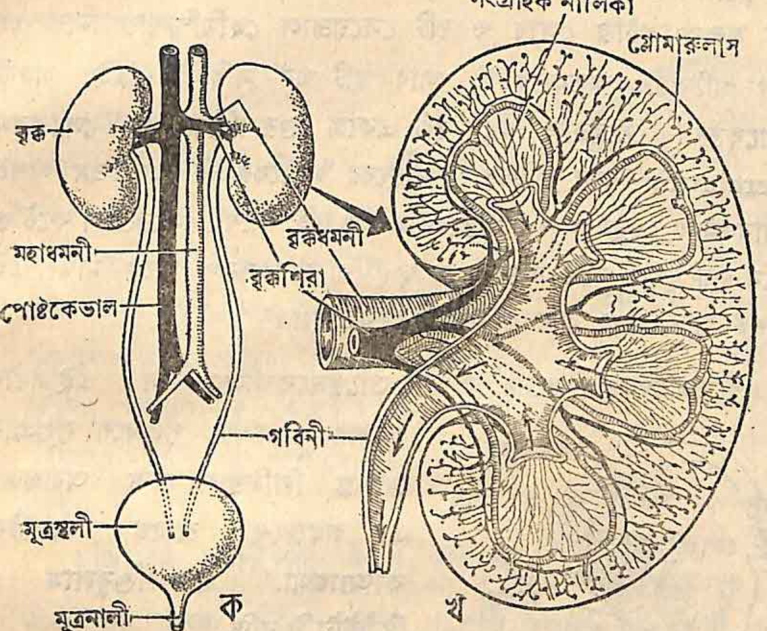
রেচনতন্ত্র ঃ রেচনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ বৃক্ক। ব্যাঙের বৃক্ক দু'টি মেরুদণ্ডের দু'পাশে উদর অঞ্চলে অবস্থিত এবং পৃষ্ঠপ্রাকারের সঙ্গে যুক্ত। পেরিটোনিয়ম পর্দার দ্বারা এরা দেহগহ্বর থেকে পৃথক হয়েছে। প্রতিটি বৃক্ক লম্বা, চ্যাপ্টা এবং গাঢ় লালচে বা বাদামী রংয়ের (চিত্র নং ৫৯)। প্রায় দু'হাজার বৃক্কনালিকা মিলে একটি বৃক্ক গঠিত। প্রতি বৃক্ক থেকে গবিনী নামে একটি নালী নেমে আসে। নালী দু'টি পরিশেষে মিলিত হয়ে একটি নালীতে পরিণত হয়। মিলিত নালীটি অবসারণীর পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত ছিদ্রপথে অবসারণীর গহ্বরে মুক্ত হয়। এই অবসারণীর অঙ্কীয় প্রাকার থেকে উৎপন্ন মূত্রস্থলী অবসারণীর গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত আছে। বৃক্কদ্বয়ের প্রধান কাজ মূত্র উৎপাদন। সেই মূত্র গবিনী দিয়ে অবসারণী গহ্বরে আসে এবং সাময়িকভাবে মূত্রস্থলীতে জমে। পরে অবসারণী ছিদ্রপথে বাইরে চলে যায়।



চিত্র নং ৫৫—
ব্যাঙের বৃক্কের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

গঠনগত পার্থক্য থাকলেও মানুষের বৃক্কের কাজ ব্যাঙের বৃক্কের অনুরূপ।

তবে মানুষের গবিনী ছ'টি নেমে এসে আলাদা আলাদা ভাবে মূত্রস্থলীতে পড়ে। মূত্রস্থলী থেকে মূত্রনালী-পথে মূত্র বাইরে চলে যায়।



চিত্র নং ৫৬—

ক—মানুষের রেচনতন্ত্র। খ—বৃক্কের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

নার্ভতন্ত্র ঃ ব্যাঙের নার্ভতন্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) **কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র,** (২) **প্রান্তস্থ নার্ভতন্ত্র,** (৩) **স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র।**

১. কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র

[Central nervous system]

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে গঠিত ঃ

মস্তিষ্ক (Brain) ঃ করোটিকের মধ্যে মস্তিষ্ক অবস্থিত। মেরুদণ্ডীর মস্তিষ্ক প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা—(ক) মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ

পুরোমস্তিষ্ক (Forebrain), (খ) মধ্যভাগ, **মধ্যমস্তিষ্ক** (Mid brain), (গ) পশ্চাদভাগ, **পরাঙমস্তিষ্ক** (Hind brain)।

পুরোমস্তিষ্ক : পুরোমস্তিষ্কের সামনের অংশকে বলে **টেলেনকেফালন**। দু'টি অলফ্যাকটরি লোব ও দুটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার নিয়ে এই অংশ গঠিত। অলফ্যাকটরি লোব দুটি ঘন সন্নিবিষ্ট। এই অঙ্গটি **ঘ্রাণকেন্দ্র**। সেরেব্রাল অংশ দুটি একত্রে **গুরুমস্তিষ্ক** বা **সেরেব্রম** (Cerebrum) বলে পরিচিত। মানুষের মস্তিষ্কের এই সেরেব্রম অংশই প্রধানতম ও বৃহত্তম অংশ। মানুষের মস্তিষ্কে এই অংশেই সেরেব্রাল কর্টেক্স নামে পুরু ধূসর বস্তুর আবরণ আছে। ব্যাঙের সেরূপ থাকে না। এই অংশই স্মৃতি, ইচ্ছা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির কেন্দ্রস্থল।

পুরোমস্তিষ্কের পিছনের অংশকে **ডায়েনকেফালন** বলে। এই সঙ্কীর্ণ অংশের অবতল পৃষ্ঠদেশে লুপ্তপ্রায় দেহযন্ত্র পিনিয়াল বডি অবস্থিত। এর অঙ্কদেশে রয়েছে **অপটিক কাঅ্যাজমা, ইনফাণ্ডিবুলাম** ও **পিটুইটারি বডি**।



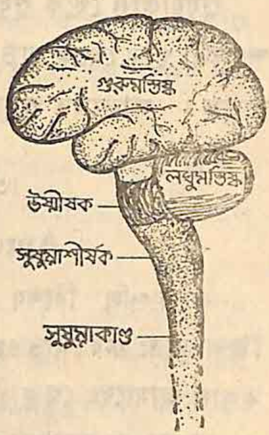
চিত্র নং ৫৭—
ভ্রূণাবস্থায় মেরুদণ্ডীর মস্তিষ্ক

মধ্যমস্তিষ্ক : এই অঞ্চলকে **মেসেনকেফালন** বলে। এই অংশের প্রধান অংশ **অপটিক লোব**। ব্যাঙের মস্তিষ্কে দু'টি **অপটিক লোব আছে**। এগুলি ব্যাঙের দৃষ্টিকেন্দ্র। মানুষের মস্তিষ্কে এই অংশে চারটি লোব আছে। সামনের লোব দু'টি দৃষ্টি গ্রাহককেন্দ্র, আর পিছনের দুটি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

পরাঙমস্তিষ্ক : অপটিক লোব দুটির পিছনে অবস্থিত পরাঙমস্তিষ্কের এই অংশকে **মেটেনকেফালন** বলে। এই অংশকে **লঘুমস্তিষ্ক** বা **সেরেবেলম** (Cerebellum)ও বলে। এই অংশটি পেশী সঞ্চালন ও

সাম্যরক্ষার কাজ করে। ব্যাঙের মস্তিষ্কের এই অংশ সঙ্কীর্ণ কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নত এবং কুণ্ডলীকৃত। তাছাড়া মানুষের সেরেবেলমের উভয় পার্শ্ব উষ্ণীষক বা পন্‌স্‌ভেরিলি (Pons) নামে নার্ভতন্তু দিয়ে অঙ্কদেশে যুক্ত।

পরাঙমস্তিষ্কের শেষ অংশকে বলে **মায়েলেনকেফালন** বা মেডুলা অবলংগাটা বা সুষুম্নাশীর্ষক। মস্তিষ্কের এই শেষ অংশ ধীরে ধীরে সরু হয়ে করোটিকের মহাবিবর (ফোরামেন ম্যাগনম) দিয়ে বের হয়ে সুষুম্না কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দৈহিক ক্রিয়াকলাপ যে তন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের পরিচালনার কেন্দ্রস্থল এই অংশ। মানুষের মস্তিষ্কে এই অংশ মোটামুটি ব্যাঙের মতই।



চিত্র নং ৫৮—মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও সুষুম্নাকাণ্ড

মস্তিষ্কের ভেণ্ট্রিকল—ফাঁকা মস্তিষ্কের মধ্যে যে গহ্বর থাকে তাকে **ভেণ্ট্রিকল**। বলে ভেণ্ট্রিকলগুলি **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** নামে তরল পদার্থে পূর্ণ।

সুষুম্নাকাণ্ড ঃ সুষুম্নাশীর্ষকের শেষ প্রান্ত থেকে **সুষুম্নাকাণ্ড** আরম্ভ। এটি মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলির মধ্য দিয়ে মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সুষুম্নাকাণ্ডের সূক্ষ্ম কেন্দ্রীয় গহ্বরটিকে **নিউরোসিল** (Neurocoel) বলে। মস্তিষ্কের সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড নিউরোসিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

২. প্রান্তস্থ নার্ভতন্ত্র

[Peripheral nervous system]

এই নার্ভতন্ত্রের অন্তর্গত হল করোটিক ও সুষুম্না নার্ভসমূহ। মস্তিষ্ক থেকে নির্গত নার্ভগুলিকেই করোটিক নার্ভ বলে। ব্যাঙের করোটিক

নার্ভের সংখ্যা দশ জোড়া। কিন্তু মানুষের আছে বার জোড়া করোটিক নার্ভ। করোটিক নার্ভ করোটিক থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত।

সুষুম্নাকাণ্ড থেকে সুষুম্না নার্ভের উৎপত্তি। পর পর সজ্জিত কশেরুকার অন্তবর্তী স্থান থেকে নার্ভগুলি বের হয়। ব্যাঙের ১০ জোড়া সুষুম্না নার্ভ আছে। মানুষের সুষুম্না নার্ভ ৩১ জোড়া।

(৩) স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র

[Autonomous nervous system]

কতকগুলি বিশেষ নার্ভ গ্যাংলিয়া, নার্ভ ও তার শাখাপ্রশাখা মিলে স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র গড়ে উঠেছে। যে সকল অঙ্গ এবং গ্রন্থির কার্যকলাপ আমাদের স্বেচ্ছাধীন নয় সেগুলিকেই স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। সুষুম্নাকাণ্ডের দুপাশে সারিবদ্ধভাবে পরস্পরযুক্ত গ্যাংলিয়া নিয়ে যে নার্ভসূত্র আছে সেটাই স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। ব্যাঙের এই নার্ভসূত্রে দশটি গ্যাংলিয়া আছে। প্রতি গ্যাংলিয়া থেকে সূক্ষ্ম নার্ভ বের হয়ে বিভিন্ন তন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ঃ ব্যাঙের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি। এর চর্ম স্পর্শেন্দ্রিয়, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা স্বাদেন্দ্রিয়, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয় এবং কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ করে। মানুষের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে গঠনগত সাদৃশ্য থাকলেও মানুষের তুলনায় ব্যাঙের ইন্দ্রিয় অনুন্নত। মানুষের বহিঃকর্ণে পিনা আছে, ব্যাঙের তা নেই।

জননতন্ত্রঃ ব্যাঙ একলিঙ্গ প্রাণী। মানুষও তাই। অর্থাৎ ব্যাঙ ও মানুষের উভয় জনন-অঙ্গ কখনই একই দেহের মধ্যে থাকে না।* পুরুষ জনন-অঙ্গ ধারণকারী প্রাণী **পুরুষ** এবং স্ত্রীজনন-অঙ্গ ধারণকারী প্রাণী **স্ত্রী** বলে পরিচিত।

* পুরুষ ব্যাঙের বিডার্স অঙ্গ কিন্তু অপরিণত ডিম্বাশয়।

পুংজননতন্ত্র ঃ পুংব্যাঙের প্রধান জনন-অঙ্গ একজোড়া **টেসটিস** (Testis) বা **শুক্রাশয়**। হালকা হলুদ বা সাদাটে শুক্রাশয় ছুটি বৃক্কদ্বয়ের অঙ্কদেশে অবস্থিত এবং পাতলা পর্দা দ্বারা যুক্ত। **সেমিনিফেরাস টিউবিউল** নামে অসংখ্য সূক্ষ্ম নালিকা মিলিত হয়ে প্রতিটি শুক্রাশয় তৈরী হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ছুটি বা তিনটি খণ্ডে শুক্রাশয় বিভক্ত। শুক্রাশয়ের প্রধান কাজ শুক্রাণু সৃষ্টি। শুক্রাশয়ের আগায় ছোট গোলাকার যে অঙ্গ দেখা যায় তাকে **বিডার্স অঙ্গ** (Bidder's organ) বলে।

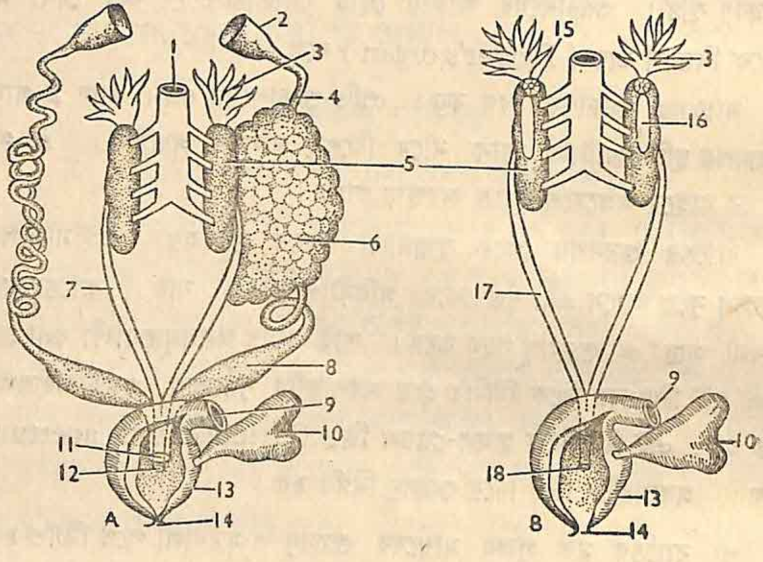
মানুষের শুক্রাশয় বেশ বড়। প্রতি শুক্রাশয়ের ওজন প্রায় ৯ গ্রাম। শুক্রাশয় ছুটি স্ক্রোটাল স্যাক নামে বিশেষ থলিতে অবস্থিত। ঐ থলি দেহের বাইরে অঙ্কদেশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

ব্যাঙের শুক্রাশয় থেকে সূক্ষ্মনালী বৃক্কতে মুক্ত হয়। এই নালীপথে শুক্রাণু বৃক্কে আসে এবং বৃক্ক থেকে গবিনী পথে চলে যায়। ব্যাঙের ছুটি গবিনী **মূত্র** ও শুক্রাণু বহন করে। তাই এদের **জননমূত্রনালী** বলা হয়। নালী ছুটি পিছনের দিকে মিলিত হয়ে অবসারণীর পৃষ্ঠদেশে একটি ছিদ্রপথে মুক্ত হয়। এই ছিদ্রটিকে **জনন-রেচন ছিদ্র** (Urinogenital aperture) বলে। অবসারণীর ছিদ্র দিয়ে শুক্রাণু নির্গত হয়।

পুং ব্যাঙের মত পুরুষ মানুষের শুক্রাণু ও মূত্রনালী পথে নির্গত হয়। তবে মানুষের প্রতি শুক্রাশয় থেকে বের হয়েছে স্বতন্ত্র নালী। ঐ নালী পথেই শুক্রাণু মূত্রনালীতে আসে। এছাড়া নানা গ্রন্থিও এই তন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে। **মানুষের বিডার্স অঙ্গ নেই।**

স্ত্রীজননতন্ত্র ঃ স্ত্রী ব্যাঙের প্রধান জনন-অঙ্গ একজোড়া **ওভারি** (Ovary) বা **ডিম্বাশয়**। ডিম্বাশয় নির্দিষ্ট আকারবিহীন থলির মত অঙ্গ। প্রতি বৃক্কের অঙ্কতলে একটি পর্দা দ্বারা ডিম্বাশয় যুক্ত থাকে। পরিণত অবস্থায় এদের রং কালো। **ডিম্বাণু উৎপাদনই এদের কাজ।** ডিম্বাশয় ডিম্বনালীর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। বৃক্কের বাইরের দিকে দেহ-গহ্বরের ছুপাশ বরাবর ছুটি ডিম্বনালী আছে। এই নালীর সামনের অংশ ফানেলের মত। পরের অংশ সরু ও প্যাঁচানো, পিছনের অংশ ফোলা। এই

ফোলা অংশ দুটি পিছনের দিকে যুক্ত হয়ে একটি সাধারণ নালী গঠন করে। সেই সাধারণ নালী অবসারণীর পৃষ্ঠদেশে একটি ছিদ্রপথে মুক্ত হয়। ঐ ছিদ্রকে জননছিদ্র বলে। এই ছিদ্রটি মূত্রছিদ্রের সামনে অবস্থিত। ডিম্বনালীপথে ডিম্বাণু অবসারণীতে আসে এবং অবসারণী ছিদ্র দিয়ে বাইরে চলে যায়।



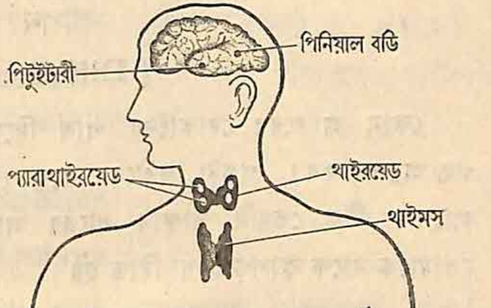
চিত্র নং ৫৯

A—স্ত্রী ব্যাঙের রেচন-জননতন্ত্র: 1—পশ্চাতের মহাশিরা, 2—ওভিডিউকাল কানেল, 3—ফ্যাট বডি, 4—ডিম্বনালী, 5—বৃক্ক, 6—ডিম্বাশয়, 7—গবিনী, 8—জরায়ু, 9—মলাশয়, 10—মূত্রাশয়, 11—স্ত্রীজনন ছিদ্র, 12—রেচন ছিদ্র, 13—অবসারণী, 14—অবসারণী ছিদ্র। B—পুরুষ ব্যাঙের রেচন-জননতন্ত্র: 15—বিডার্স অঙ্গ, 16—শুক্রাশয়, 17—গবিনী, 18—রেচন-জনন-ছিদ্র।

স্ত্রীলোকের জননতন্ত্র স্ত্রী ব্যাঙের জননতন্ত্রের অনুরূপ হলেও অনেক জটিল। এখানে স্ত্রীজনন ছিদ্র স্বতন্ত্র ছিদ্ররূপে অবস্থিত। এই ছিদ্রকে যোনি বলে।

ব্যাঙের ডিম্বাণু (Egg) দেহের বাইরে নিষিক্ত হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রীজননতন্ত্রের নালীতে ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু বেড়ে বেড়ে ভ্রূণে পরিণত হয়। ভ্রূণ পরিণত মানব শিশুর রূপ নিয়ে এক সময় যোনি পথ বেয়ে বাইরে চলে আসে।

এণ্ডোক্রিন্‌তন্ত্র—হরমোন হল এক বিশেষ উত্তেজক রস। দেহের কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে এই রস দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। হরমোন-সৃষ্টিকারী অধিকাংশ গ্রন্থিই নালীহীন। হরমোন রক্তের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবেশিত হয়। তবে কয়েকটি নালীযুক্ত গ্রন্থিও হরমোন সৃষ্টি করে। হরমোন-সৃষ্টিকারী গ্রন্থিগুলি নিয়ে রচিত তন্ত্রই এণ্ডোক্রিন তন্ত্র। দেহের বিভিন্ন স্থানে এই গ্রন্থিগুলি অবস্থিত।



চিত্র নং ৬০—মানুষের দেহে এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির অবস্থান

ব্যাঙের মুখবিবরের মধ্যে অবস্থিত **থাইরয়েড গ্রন্থি**, থাইরয়েড গ্রন্থির নিকটবর্তী **প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি**, মস্তিষ্কে অবস্থিত **থাইমস গ্রন্থি**, মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত **পিটুইটারী গ্রন্থি**, প্রতি বৃক্কের অঙ্কদেশে অবস্থিত **অ্যাডরিনাল** গ্রন্থি এবং **অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি** ও **গোনাড** (ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়) এই তন্ত্রের অন্তর্গত। মানুষের দেহেও এই গ্রন্থিগুলি বিদ্যমান।* উপরের ছবিতে মানুষের দেহে গ্রন্থিগুলির অবস্থান লক্ষ্য কর।

* এদের সৃষ্ট হরমোনের কার্যকলাপ দশম শ্রেণীর পাঠ্য। তোমরা দশম শ্রেণীতে পড়বার সময় এই বিষয়ে আরো বিশদভাবে জানতে পারবে।

৫ কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনা

[Some Phenomena]

ব্যাপন

[Diffusion]

কোন আতরের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় তুমি একটা মিষ্টি গন্ধ অনুভব কর। গন্ধটা শরীরের মধ্যে টেনে নিতে তোমার খুব ভাল লাগে। ঠিক তেমনি রাস্তার ধারের আবর্জনার স্তূপও দুর্গন্ধ ছড়ায়। তোমাকে নাকে কাপড় চাপা দিতে হয়

এ ব্যাপারটা ঘটে উঁচু ঘনত্ব থেকে পদার্থের নিচু ঘনত্বের দিকে ছুটে চলার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে। ছুটে চলা অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না দুজায়গার ঘনত্ব সমান হয়। এই প্রাকৃতিক ঘটনাকেই বলে **ব্যাপন**। পেট্রোল বা সেন্টের মত উদ্বায়ী (Volatile) তরল পদার্থ বা কর্পূর বা নেপথালিন বলের মত কঠিন পদার্থ ঐ একই নিয়মে, অর্থাৎ ব্যাপন ক্রিয়ায় বাষ্পাকারে তাদের গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে দেয়।

তরল পদার্থে কোন কঠিন বা গ্যাসীয় পদার্থ দ্রবীভূত হলেও ব্যাপন ক্রিয়া ঘটে। তবে তার দ্রুততা আগের তুলনায় অনেক কম। এক গ্লাস জলে একদানা চিনি, বা নুন বা পটাশিয়ম প্যারম্যাঙ্গানেট ফেল। দেখ এই পদার্থগুলো ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ঐ সব দানার উপাদানগুলি বেশী ঘনত্বের দিক থেকে দূরে অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। একটু পরেই ঐ দানাগুলো অন্তর্হিত হয়। আবার কয়েকটি দানা জলে ফেল। দেখ এগুলোও মিলিয়ে যায়। এইভাবে কিছু কিছু দানা ফেলতে থাকলে একসময় অবাক্ হয়ে দেখবে যে, দানা আর গলছে না। এর অর্থ হল ব্যাপন ক্রিয়ায় অল্প ঘনত্বের দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে যে জায়গার দরকার নতুন ফেলা দানাগুলোর কাছে সে সুযোগ থাকছে না।

অন্যভাবে বলা যায়, সমগ্র জলীয় পদার্থটির ঘনত্ব অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে, ফলে ঘনত্বের সমতাও এসেছে। ঘনত্বের অসাম্য থাকলে তবেই ব্যাপন চলে। সাম্যাবস্থা (Equilibrium) এলেই ব্যাপন বন্ধ হয়। তাই এখানেও ব্যাপন বন্ধ হয়ে গেল।

উদ্ভিদের জীবনে এই ব্যাপন ক্রিয়ার গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমেই গাছের পাতা, কাণ্ড প্রভৃতিতে বাতাসের কার্বন ডায়ক্সাইড বা অক্সিজেনের আদান-প্রদান চলে। উদ্ভিদদেহে মাটির রস শুষে নিতেও প্রধানতঃ এই প্রক্রিয়া সাহায্য করে।

অভিস্রবণ
[Osmosis]

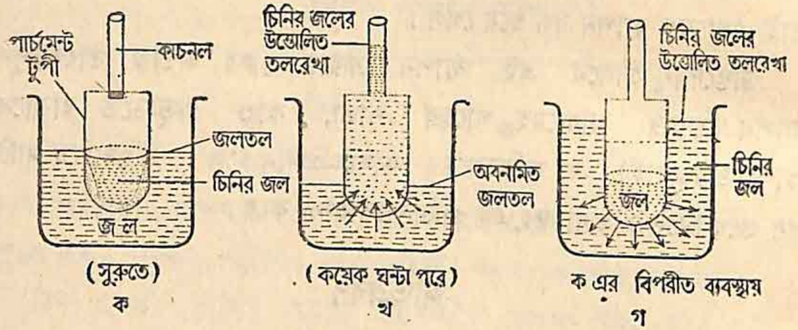
উপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল তাতে ব্যাপনকালে পদার্থগুলো একে অপরের সঙ্গে গায়ে গায়ে লেগে থাকে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এখন যদি তুমি দুটি বিভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণের মাঝে একটা মাছের পটকা বা **পার্চমেণ্ট পর্দা** (Parchment membrane) খাড়া কর তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে দেখবে। **কম ঘনত্বের তরলটি বেশী ঘনত্বের তরলের দিকে দ্রুত চলে যাচ্ছে।** অবশ্য অল্প হলেও তরল পদার্থটি বেশী ঘনত্বের থেকে কম ঘনত্বের দিকেও যেতে থাকে। এই পদ্ধতিকেই **অভিস্রবণ** বলে। সহজ কথায় বলা যায়, **অভিস্রবণ প্রকৃতপক্ষে একটা বিশেষ ধরনের ব্যাপন ছাড়া কিছুই নয়। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে মাটির জল ও পুষ্টিকর রস টেনে নিয়ে বেঁচে থাকে।**

এই সত্যটাই এবার কয়েকটা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যাক্।

অভিস্রবণের সহজ পরীক্ষা
[Simple experiment on Osmosis]

পরীক্ষা ১. পদ্ধতি (Procedure) : পার্চমেণ্ট কাগজের তৈরী পরীক্ষা নলের মত একটা ছোট পার্চমেণ্ট টুপী নাও। তাতে চিনিগোলা জল একটা

নির্দিষ্ট দাগ পর্যন্ত ভর্তি কর। তারপর টুপীর মুখটায় একটা সরু কাচনল বসিয়ে জল ও বায়ু-নিরোধক ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দাও (ছবি দেখ)। এবার সেটিকে



চিত্র নং ৬১—অভিস্রবণের পরীক্ষা

জল ভর্তি একটা বিকারে ডুবিয়ে দাও (ক-চিত্র)। বিকারের জল ও ভিতরের জলের উচ্চতা বরাবর দাগ দিয়ে রাখ।

পর্যবেক্ষণ (Observation) : কয়েক ঘন্টা বাদে দেখ বিকারের জলের উচ্চতা নেমেছে আর পার্চমেন্ট টুপীর মধ্যের চিনিগোলা তরলের উচ্চতা বেড়ে গেছে (খ-চিত্র)। পাশাপাশি একইভাবে রাখা বিপরীত ব্যবস্থা যুক্ত বিকারে চিনি গোলা জল ও পার্চমেন্ট টুপীতে সাধারণ জল রেখে ঠিক উল্টো ব্যাপারই দেখা গেল (গ-চিত্র)। এখানে টুপীর তরলের মাত্রা উপরে ওঠার পরিবর্তে নিচে নেমে গেছে।

সিদ্ধান্ত (Inference) : উপরের পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে দুই ভিন্ন ঘনত্বের তরলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী কোন পর্দা রাখলে বেশী ঘনত্বের তরলের দিকে কম ঘনত্বের তরল দ্রুত ছুটে যায়। এটা অভিস্রবণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

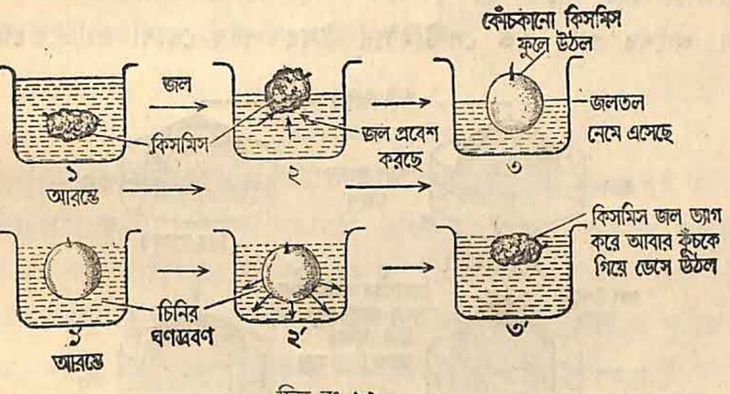
এই প্রক্রিয়া কিভাবে উদ্ভিদ কাজে লাগায় দেখা যাক্। উদ্ভিদকোষে যে তরল থাকে তার ঘনত্ব মাটির রসের ঘনত্বের থেকে সব সময় বেশী থাকে। ফলে মাটি থেকে কম ঘনত্বের তরল বেশী ঘনত্বের তরলের দিকে, অর্থাৎ উদ্ভিদকোষের মধ্যে প্রবেশ করে। এককোষী মূলরোমের মাধ্যমে মাটি ও

জীবন্ত দেহকোষের মধ্যে অভিস্রবণ চলে। মূলরোমের কোষপ্রাকার পার্চমেন্ট টুপী বা মাছের পটকার মত কাজ করে।

পরীক্ষা ২. পদ্ধতি (Procedure) : একটি একেবারে শুকনো কিশমিশ আর একটি টস্‌টসে তাজা আঙ্গুর যোগাড় কর। একটি পাত্রের সাধারণ জলের শুকনো কিশমিশ ও অন্য পাত্রের চিনি গোলা জলে তাজা আঙ্গুর ডুবিয়ে দাও। পাত্রের জলের উচ্চতা বরাবর দাগ দাও। আধঘন্টা অপেক্ষা কর।

পর্যবেক্ষণ (Observation) : নির্দিষ্ট সময় পরে দেখ একদিকে কোঁচকান কিশমিশ ফুলে উঠে গোল হয়ে গেছে আর অন্যদিকে তাজা আঙ্গুর কুঁচকে গিয়ে ভেসে উঠেছে।

এছাড়া যে পাত্রে কিশমিশ ছিল তার জলতল নেমে গেছে। আর যে পাত্রে তাজা আঙ্গুর ছিল তার জলতল উপরে উঠেছে।



চিত্র নং ৬২—

সিদ্ধান্ত (Inference) : কিশমিশের মধ্যে রসের ঘনত্ব বেশী। তাই জলে রাখার কিছুক্ষণ পরেই অভিস্রবণের মাধ্যমে কিশমিশ সাধারণ জল শুষে নেয়। এতে কোঁচকান কিশমিশ ফুলে ওঠে। এদিকে পাত্রের জল শুষে নেওয়ার জন্য জলতল নেমে যায়।

আবার বেশী ঘনত্বের জলে আঙ্গুর রাখার ফলে উল্টো ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। আঙ্গুরের ভিতরের রসের ঘনত্ব কম থাকায় তার মধ্যে যেটুকু রস ছিল

তাও বাইরে চলে যায়। ফলে টস্‌টসে গোল আঙ্গুর চুপসে গিয়ে ছোট হয়। সেইসঙ্গে আঙ্গুর থেকে রস বেরিয়ে পাত্রের জলে মেশে। ফলে পাত্রের জলতল উপরে উঠে যায়।

কম ঘনত্বের পদার্থ যখন কোষ মধ্যবর্তী বেশী ঘনত্বের দিকে দ্রুত ছুটে যায় তাকে **অন্তঃঅভিস্রবণ** (Endosmosis) বলে।

মাটি থেকে রস-শোষণ প্রক্রিয়া তো জানা গেল, এবার সেই রস কিভাবে এককোষ থেকে অন্য কোষে চলে যায় তা জানা দরকার। সেটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে তা একটা অতি সহজ প্রক্রিয়ায় দেখান যায়।

কোষান্তর অভিস্রবণের পরীক্ষা ঃ আলু অসমোস্কোপ

[Cell to cell osmosis : Potato osmoscope]

পরীক্ষা ৩. পদ্ধতি (Procedure) ঃ একটা বড় আলুকে এমনভাবে আধাআধি কাট যাতে খণ্ড দুটোকে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। নিচের কাটা অংশের প্রায় এক সেন্টিমিটার উপর পর্যন্ত খোসা ছাড়িয়ে ফেল।



চিত্র নং ৬৩—আলু অসমোস্কোপ

দুটো অর্ধাংশেই সমান মাপের দুটো গভীর গর্ত কর (ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে)। একটা খণ্ডকে সিদ্ধ করে নাও (খ)। এখন খণ্ড দুটোর প্রত্যেকটার মধ্যে চিনি গোলা জল ঢেলে আলুর খণ্ড দুটোকে দুটো পৃথক জল ভর্তি ডিসে বসিয়ে দাও।

পর্যবেক্ষণ (Observation) ঃ ২৪ ঘণ্টা বাদে সিদ্ধ আলুর মধ্যে (খ) কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা না গেলেও টাটকা অসিদ্ধ (ক) আলুখণ্ডের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। অসিদ্ধ আলুর গর্ত ছাপিয়ে জল নিচে গড়িয়ে পড়ে।

সিদ্ধান্ত (Inference) ঃ এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হল যে এখানেও অন্তঃঅভিস্রবণ চলেছে। আলুর গর্তে রাখা চিনি গোলা বেশী ঘনত্বের জলের দিকে সাধারণ জল দ্রুত চলে গেছে। ছোট গর্তে ঐ অতিরিক্ত জলের স্থান সঙ্কুলান সম্ভব না হওয়ায় জল উপচিয়ে পড়ে যেতে থাকে। আলু নিশ্চয় একটা কোষে তৈরী নয়। আলুর দেহে অসংখ্য পরস্পর-সংলগ্ন কোষ আছে। তাই এই পরীক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আলুর এক কোষ থেকে অন্যকোষে অন্তঃঅভিস্রবণ চলেছে। এইভাবে জল উপরের গর্তে গিয়ে পৌঁছেছে। যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহের এক কোষ থেকে অন্য কোষে জল ও মাটির রস পরিবাহিত হয় তাকে বলে **কোষান্তর অভিস্রবণ** (cell to cell osmosis)।

শোষণ
[Absorption]

উপরের পরীক্ষা থেকে এটাও বোঝা গেল যে **অভিস্রবণের পরিণতি হল রসশোষণ**। শোষণ পদ্ধতিটি উদ্ভিদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাটির মধ্যে জলেগোলা বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থে তৈরী রসই উদ্ভিদ খাদ্যের প্রধান উপাদান। এগুলো মূলের সাহায্যেই মাটি থেকে গৃহীত হয়। **জীবন্তকোষে রস টেনে নেওয়ার পদ্ধতিকেই বলে শোষণ।**

মূল দ্বারা জল শোষণের পরীক্ষা
[Experiment demonstrating absorption of water by roots]

পরীক্ষা ১. পদ্ধতি (procedure) ঃ যত্ন করে একটা চারাগাছ মাটি থেকে এমনভাবে ওঠাও যাতে ওর মূলগুলোয় আঘাত না লাগে। পরের পাতার ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে সেইভাবে পরীক্ষাপাত্র তৈরী কর। অর্থাৎ একটি কনিক্যাল ফ্লাস্কে গলা পর্যন্ত জল ভর্তি কর। এবার চারাগাছটির মূল ঐ জলে

ডুবিয়ে দাও। জলের উপরে কয়েক ফোঁটা সরষের তেল দাও। এতে জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে না। কিছুটা তুলো নিয়ে ফ্লাস্কের মুখে এমনভাবে



চিত্র নং— ৫৬ মূল : দ্বারা জল শোষণের পরীক্ষা

গুঁজে দাও যাতে গাছটি খাড়াভাবে থাকতে পারে। একইভাবে ডানদিকে গাছ ছাড়া একটি পরীক্ষাপাত্র ঠিক রাখ। জানালার ধারে দুটো পরীক্ষা পাত্রকেই কয়েকদিন রেখে দাও।

পর্যবেক্ষণ (Observation) : কয়েকদিন পর দেখ, যে ফ্লাস্কে গাছ আছে তার জলতল অনেক নিচে নেমে গেছে। গাছ ছাড়া পরীক্ষাপাত্রের জল কিন্তু একেবারেই নামেনি।

সিদ্ধান্ত (Inference) : উপরের পরীক্ষা থেকে এটাই প্রমাণিত হল যে উদ্ভিদ মূল দ্বারা জল বা রস শোষণ করে। কেন না গাছবিহীন ফ্লাস্কের জলতল নিচে নামেনি।

এখন জানা গেল উদ্ভিদ তরল পদার্থ শোষণ করে কিন্তু তারা কি কঠিন পদার্থও শোষণ করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে নিচের পরীক্ষাটি করে দেখ।

উদ্ভিদ কঠিন পদার্থ শোষণ করে কিনা তার পরীক্ষা :

পদ্ধতি (procedure) : আগের মত দু'টো পরীক্ষা পাত্র ঠিক কর। প্রত্যেকটিতেই একটা করে চারাগাছ লাগাও।

একটা ফ্লাস্কের জলে 'ইয়োসিন' রং-এর তরল মেশাও ; আর অন্যটিতে কয়েক টুকরো 'কারমাইন'-এর দানা মেশাও।

লক্ষ্য কর ইয়োসিনের দ্রবণ দ্রুত সমভাবে জলে ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ জলটি সমানভাবে লাল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে কারমাইনে জলও লাল রং হয়। কিন্তু দেখ সেখানে কারমাইন আগের মত গলে যায় না বরং তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম কঠিন দানায় পরিণত হয়ে জলে ভাসতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ (Observation) : কয়েক ঘণ্টা বাদে উভয় ফ্লাস্কের জলতলই নেমে যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে উভয় চারাগাছই জল শুষে নিয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য, যে ব্যাপারটি নজর কাড়ে তা হল, ইয়োসিন জলে রাখা চারাগাছটির দেহে লালের ছোপ লেগেছে। কিন্তু কারমাইন জলে রাখা চারাগাছটিতে তেমন ছোপ দেখা যাচ্ছে না।

সিদ্ধান্ত (Inference) : এর থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে উদ্ভিদ কারমাইনের মত কঠিন পদার্থ দেহে শুষে নিতে পারে না। অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্য যেমনই হোক না কেন তাকে উদ্ভিদ কেবলমাত্র তরল অবস্থাতেই শোষণ করতে পারে।

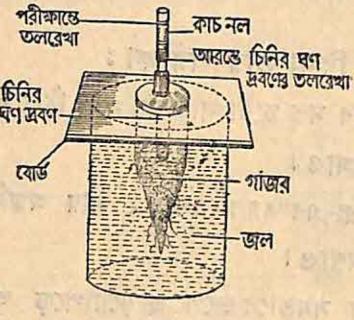
এবার একটা সুন্দর পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যাক মূল কিভাবে উপরের প্রক্রিয়াগুলিকে কাজে লাগায়। এর জন্যে পর পৃষ্ঠার ছবির মত পরীক্ষাপাত্র তৈরী করতে হবে।

পরীক্ষা : গাজরের অসমোস্কোপ

[Carrot osmoscope]

পদ্ধতি (procedure) : একটি টাটকা গাজরের উপরের সামান্য অংশ কেটে তাতে একটা গর্ত তৈরী কর। গর্তটি অধিক ঘনত্বের চিনি

গোলা এবং লাল রং দেওয়া জলে ভর্তি কর। গর্তের মুখটি একটি ছিপি দিয়ে এঁটে দাও। ছিপির গর্তে একটি মাপমত সরু কাচনল লাগাও। এখন ঐ জোড়মুখগুলো ভেসলিন দিয়ে যথাসম্ভব বায়ু-নিরোধক কর। একটি জলভর্তি পাত্র নাও। সেই সঙ্গে একটি কার্ডবোর্ড নাও যাতে গাজরটিকে ধরে রাখতে পারে এমন একটি গর্ত থাকবে। কার্ডবোর্ড দ্বারা জলের ছিদ্রের পাত্রটি ঢেকে কার্ডবোর্ডের মধ্য দিয়ে গাজরটি এমন ভাবে ঢুকিয়ে দাও যাতে ওটার নিচের অংশ জলে ডুবে থাকে।



চিত্র নং—৬৫ গাজরের অসমোস্কোপ

পর্যবেক্ষণ (Observation) : কয়েক ঘণ্টা পর পরীক্ষা পাত্র পর্যবেক্ষণ কর। দেখ কাচনলের অনেকটা উপরে লাল রংয়ের তরল উঠে গেছে।

সিদ্ধান্ত (Inference) : এর কারণ হল মূলরোম বিকারের লাল জল শুষে নিয়েছে। সেই জল কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ উপরে উঠে গেছে। **একই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের মূলও মাটির রস শোষণ করে।**

এর মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে দেখ। বিকারের জল চেখে দেখলে দেখবে তা মিষ্টি নয়। অর্থাৎ কোষগুলো গাজরের মধ্যে রাখা চিনি গোলা জলকে বিকারে ফিরে আসতে দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে গাছেও এমন ঘটনাই ঘটে। গাছের ভিতরের অধিক ঘণত্বের রস মাটিতে সাধারণতঃ ফিরে যায় না। পরন্তু জলে গোলা অবস্থায় মাটিতে যে সব লবণ থাকে তা মূলরোম শোষণ করে উপরে পাঠায়। মূলরোমের পক্ষেই এটা সম্ভব। কেননা তার বাইরে এমন একটা পর্দা আছে যা নির্ধারণ করতে পারে কোন পদার্থটি শোষণের যোগ্য আর কোনটি অযোগ্য। এটা হল কোষপর্দার এক বিশেষ ক্ষমতা।

পরিবহন

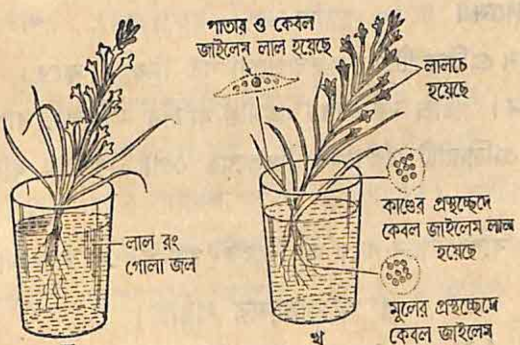
[Conduction]

এই মাত্র জানলে যে উদ্ভিদ তাদের মূলরোম দিয়ে রস ও জল শোষণ করে। এই রসকে উপরে পাতায় পাঠান দরকার। কেননা প্রধানত পাতাই খাদ্য তৈরীর কাজে এগুলি ব্যবহার করে। **যে পদ্ধতিতে উদ্ভিদদেহে একস্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্য চলাচল করে তাকেই বলে পরিবহণ।** মূল যে তার বিশেষ বিশেষ নল দিয়ে ঐ রস কাণ্ডে পাঠায় এবং একইভাবে কাণ্ডও যে তার নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ নল দিয়ে সেই রসকে পাতায় পৌঁছে দেয় তা নিচের পরীক্ষা থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যাবে।

পরিবহনের পরীক্ষা

[Experiment of conduction]

পদ্ধতি (procedure) : একটি গ্লাসে জল নিয়ে তাতে কিছুটা লাল কালি গুলে দাও। একটি মূল সমেত তাজা রজনীগন্ধা গাছের মাটি পরিষ্কার



চিত্র নং—৬৬ : পরি:হণের পরীক্ষা

করে তার মূল যথাসম্ভব অক্ষত রেখে ঐ গ্লাসের জল দাঁড় করাও। কয়েক ঘণ্টা একইভাবে রেখে দাও। তারপর মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রস্থচ্ছেদ নাও। সেগুলো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা কর।

পর্যবেক্ষণ (Observation) : দেখ ঐ ছেদগুলোর কতকগুলো বিশেষ অংশই কেবল রঙ্গীন হয়েছে। বিশেষ ঐ অংশগুলো ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে ওগুলো হচ্ছে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের জাইলেম অংশ।

সিদ্ধান্ত (Inference) : এ থেকে প্রমাণ হল যে, মূলের জাইলেম দিয়ে যে রসের শোষণ ঘটল তা একই পথে অর্থাৎ কাণ্ডের জাইলেমের মধ্যে দিয়েই উপরে উঠেছে এবং সবশেষে পাতার জাইলেমের মধ্য গিয়ে শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে।

বাষ্পমোচন
[Transpiration]

গাছ মাটি থেকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় রস ও জল শুষে নেয়। মাটির জলে অল্প পরিমাণেই খাদ্য গোলা থাকে। তাই প্রয়োজন মেটাতে গাছকে অনেক বেশী জল শুষে নিতে হয়। কিন্তু অতিরিক্ত জল গাছের কোন কাজেই আসে না পরন্তু তা ক্ষতিকর হতে পারে। এজন্যে গাছ বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় ঐ অতিরিক্ত জল নিজদেহের বাইরে পরিত্যাগ করে। **যে প্রক্রিয়ায় গাছ ঐ উদ্বৃত্ত জল বাষ্পাকারে ছেড়ে দেয় তাকেই বলে বাষ্পমোচন।**

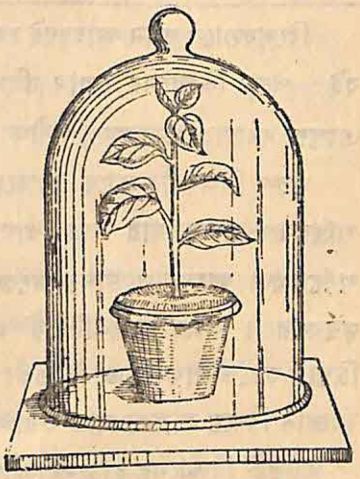
বাষ্পমোচন প্রক্রিয়াটিকে কতকগুলো সর্ত নিয়ন্ত্রণ করে। এদের মধ্যে আলোই প্রধান। তীব্র নয় অথচ সহনীয় মাত্রার আলোয় বাষ্পমোচন ভাল চলে। এই প্রক্রিয়াটি কোষের ভিতরের প্রোটোপ্লাজম দ্বারা কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়।

গাছ যে বাষ্পমোচন করে তা নিচের পরীক্ষা থেকে জানা যায়।

বাষ্পমোচনের পরীক্ষা
[Experiment on Transpiration]

পদ্ধতি (procedure) : টবে লাগান একটি চারাগাছ জোগাড় কর। টবের মাটিতে জল ঢাল। পুরো টবটি বা উপরের মাটি পলিথিনের বা প্লাসটিকের কাগজে ঢেকে দিয়ে সুতো দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দাও যাতে কোন ফাঁক না থাকে।

এবার টবটিকে টেবিলের উপরে একটি কাচ খণ্ডের উপরে বসাও এবং টব সমেত গাছটিকে একটি বেলজার দিয়ে ঢেকে দাও। বেলজারের কিনারা ভেসলিন বা তরল মোম দিয়ে বায়ু নিরোধক কর। পরীক্ষাটি এমন জায়গায় করতে হবে যেখানে যথেষ্ট আলো আসতে পারে।


চিত্র নং ৬৭ – বাষ্পমোচনের পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ (Observation): কিছুক্ষণ বাদে দেখবে বেলজারের গায়ে শিশির বিন্দুর মত জল জমেছে।

সিদ্ধান্ত (Inference): টবের মাটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তাই ঐ মাটি থেকে জলকণা বেরুতে পারেনি। এক্ষেত্রে কেবল গাছটিই বেলজারের সংস্পর্শে আছে। তাই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঐ গাছটিই বাষ্পাকারে জলকণা ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ গাছটি বাষ্পমোচন করেছে। গাছের থেকে পরিত্যক্ত বাষ্প বেলজারের ঠাণ্ডা গায়ে লেগে জলাকণায় পরিণত হয়েছে।

বাষ্পমোচনের দ্বারা উদ্ভিদের লাভ
[Merits of Transpiration]

বাষ্পমোচনের ফলে গাছের অনেক সুবিধে হয়। অতিরিক্ত জল ত্যাগ ছাড়াও গাছের মধ্যে রসের স্রোত বজায় রাখতে এই প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট সহায়তা করে। তাছাড়া গাছকে ঠাণ্ডা রাখতেও এর অবদান কম নয়।

এদিকে বাষ্পমোচনের টানে মাটির রসশোষণে সাহায্য পাওয়া যায়। কোষের জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে কোষে কোষে জলের মাত্রা কমে। এতে কোষরসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে এদের আরও জল শোষণ করার ক্ষমতা বাড়ে। গাছের সর্বাঙ্গে জল ছড়িয়ে পড়তেও বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ার অবদান কম নয়।

৬ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা

[Observation and Experiments]

বিশেষভাবে জ্ঞান আহরণই হল বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র বই পড়ে বিজ্ঞানের কোন বিষয়েই সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। এজন্যে দরকার পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও সবশেষে স্থির সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতা।

তরুণ শিক্ষার্থীর কাছে সবচেয়ে যেটা মূল্যবান তা হল পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যার যত প্রখর সে ততই দ্রুত সফলতা লাভ করে। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানর জন্যে প্রখর দৃষ্টিশক্তি তথা একাগ্রতা বাড়ান দরকার। নিজ নিজ বিষয়ে মনসংযোগ করে সেই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলে তবেই একাগ্রতা আসা সম্ভব। একাগ্রতা না থাকলে বিজ্ঞান বিষয়ে সাফল্য লাভ করা যায় না।

প্রতিটি বিজ্ঞানের ছাত্রকে কৌতূহল হতে হবে। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় খোলা রাখতে হবে। জীবন ও পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতুহলী না হলে সার্থক বিজ্ঞানী হওয়া যায় না। বিশ্বের যত সব যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছে তাদের মূলে আছে অনন্ত কৌতুহল। কৌতুহলই বিজ্ঞানীকে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়।

তাই তোমাদের মত তরুণ শিক্ষার্থীর একদিকে যেমন থাকবে কৌতুহল অন্যদিকে থাকবে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে কোন কিছুর সত্যাসত্য বিচার করার একান্ত আগ্রহ।

বই পড়ে যে যে বিষয়ে তুমি জ্ঞান লাভ করলে তা কতদূর সত্য পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই কর। দেখ হাতেকলমে যে জ্ঞান লাভ করছো তা পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে মেলে কিনা। কোথাও কোন সন্দেহ থাকলে তা নিরসনের জন্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা কর। তাঁর কাছ থেকে জেনে নাও কোন বিষয়ে জ্ঞান বাড়াবার জন্যে আরও কি কি বই পড়তে হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ভিদকোষ, প্রাণিকোষ এমনকি উদ্ভিদকলা, কাণ্ডের, মূলের বা পাতার গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছো। ঐ অঙ্গগুলি কি কি কলা দিয়ে গঠিত তা তোমার জানার কথা। ছবিতে তাদের পরস্পর

সম্বন্ধ ও অবস্থান সম্বন্ধেও তোমার ধারণা হয়েছে। এখন সত্যি সত্যি একটি কাণ্ড, মূল বা পাতার ছেদ নিজের হাতে কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করে দেখতে হবে ছবিতে দেখান গঠনের সঙ্গে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখা জিনিসটির গঠনে সাদৃশ্য আছে কিনা। **সূক্ষ্ম ছেদ কাটা রীতিমত অভ্যাসের ব্যাপার।** ছেদ মোটা হলে তার মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মি যেতে পারে না। তাই তা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র সত্যিই তোমাদের কাছে এক বিস্ময়। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বল ঐ যন্ত্রটির গঠন ও ব্যবহার সম্বন্ধে তোমাদের শিখিয়ে দিতে। তিনি তোমাদের বলবেন যে প্রথমে **নিচু ক্ষমতার অভিলক্ষ্যের** (low power objective) ব্যবহার করতে হয়। কোন বিশেষ অংশের পরিবর্ধিত রূপ **উঁচু ক্ষমতার অভিলক্ষ্যের** সাহায্যে দেখা সম্ভব।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যা দেখছ তা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক খাতায় এঁকে ফেল। তারপর বিভিন্ন অংশগুলো লেবেল কর। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দেখিয়ে নাও তোমার পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ আঁকা ও লেবেল করা ঠিক হয়েছে কিনা। ঠিক হলে তাঁর সই নিয়ে নাও। প্রতিদিনের কাজের তারিখ দিতে ভুলবে না।

আরশোলার বহিরাকৃতি

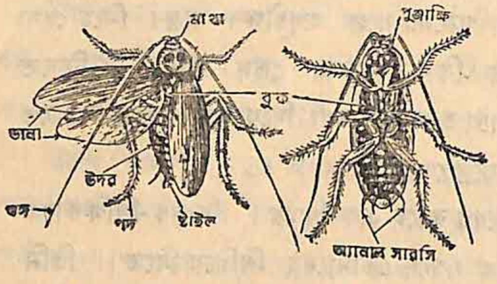
[External features of cockroach]

আরশোলার দেহ মাথা, বুক ও উদর এই তিনটি অংশে বিভক্ত। সারা দেহ **কিউটিকল** নামক শক্ত বাদামী রং-এর আবরণে ঢাকা। দেহটি মোটামুটি চ্যাপ্টা।

মাথা দেহের তুলনায় যথেষ্ট ছোট। একজোড়া সুবৃহৎ পুঞ্জাক্ষি (compound eye) ও একজোড়া শুঙ্গ (Antenna) মাথায় অবস্থিত। শুঙ্গের দৈর্ঘ্য দেহের দৈর্ঘকেও ছাড়িয়ে যায়। এটা সূতার মত সন্ধিল উপাঙ্গ। পুঞ্জাক্ষি বৃক্কাকৃতি ও বৃন্তহীন।

মাথার অঙ্কদেশে **মুখছিদ্র** অবস্থিত। বুক **পুরোবক্ষ, মধ্যবক্ষ** ও **পশ্চাৎবক্ষ** এই তিনটি অংশে বিভক্ত। মধ্যবক্ষ ও পশ্চাৎবক্ষের পৃষ্ঠদেশ থেকে উঠেছে দুজোড়া ডানা। সম্মুখের ডানা জোড়া পিছনের ডানা জোড়া থেকে

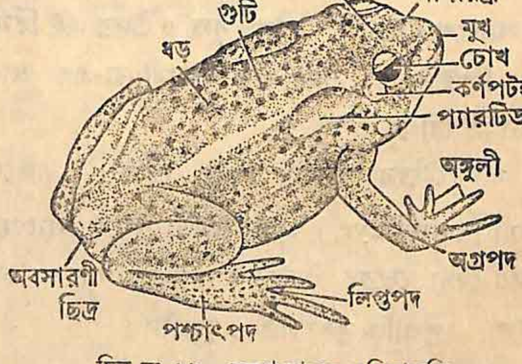
আকারে বড়। বুকে তিন জোড়া সন্ধিল পা (jointed leg) অবস্থিত। বুকের পরের অংশই উদর। উদর ১০টি দেহখণ্ডে গঠিত। আরশোলার ১০ম দেহখণ্ডে আছে সন্ধিল উপাঙ্গ অ্যানাল সারসি (Anal cerci)। তবে পুরুষ আরশোলার ৯ম দেহখণ্ডে আছে অতিরিক্ত অসন্ধিল ছোট দুটি উপাঙ্গ —যার নাম দেওয়া হয়েছে অ্যানাল স্টাইল (Anal style)। আরশোলার দেহে বুক ও উদরের দুপাশে মোট দশজোড়া অতি সূক্ষ্ম শ্বাসছিদ্র বা স্পিরাকল (spiracle) বর্তমান। আরশোলার দেহের শেষ দেহখণ্ডের প্রান্তে পায়ু অবস্থিত।



চিত্র নং ৬৮—আরশোলার বহিরাকৃতি

ব্যাঙের বহিরাকৃতি
[External features of Toad]

ব্যাঙের দেহ মাথা ও ধড় এই দুটি অংশে বিভক্ত। ব্যাঙের দেহে ঘাড় বলে কোন অংশ নেই। কুনো ব্যাঙের দেহ ধূসর রং-এর খসখসে ও আঁচিল (wart) বহুল চামড়ায় ঢাকা থাকে। তবে সোনা ব্যাঙের দেহের চামড়া মসৃণ ও সবুজ রং-এর। চ্যাপ্টা মাথার আগায় দুটি চোয়ালে আবদ্ধ মুখটি অবস্থিত। উপরের চোয়ালের উপরেরদিকে মধ্যরেখার দুপাশে দুটি নাসারন্ধ্র (Nostril) বর্তমান। প্রতি নাসারন্ধ্রের পিছনে একটি করে উজ্জ্বল বৃহৎ চোখ অবস্থিত। উপরের



চিত্র নং ৬৯—কুনোব্যাঙের বহিরাকৃতি

পাতা ও নিচের পাতা ছাড়াও চোখে থাকে উপপল্লব (Nictitating membrane)। মাথার দুপাশে উভয় চোখের পিছনে আছে কর্ণপটহ (Tympanum)।

ধড় দেহের অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে। কর্ণপটহের ঠিক পিছনে সবচেয়ে বড় লম্বাটে আঁচিল বা গ্রন্থিটিকে বলে প্যারটিড গ্রন্থি (Parotid gland)। ধড়ের সামনের অংশ বুক ও পিছনের অংশ উদর। ধড়ের সামনের দিকে দুটি অগ্রপদ ও পিছনের দিকে দুটি পশ্চাৎপদ আছে।

অগ্রপদ—প্রগণ্ড, পুরোবাহু, করতল ও অঙ্গুলিতে বিভক্ত। অগ্রপদে আছে চারটি অঙ্গুলি। পশ্চাৎপদ—উরু, জানুতল, পদপৃষ্ঠ ও অঙ্গুলিতে বিভক্ত। পশ্চাৎপদে থাকে পাঁচটি অঙ্গুলি। পশ্চাৎপদের অঙ্গুলিগুলি একপ্রকার পাতলা চামড়া দিয়ে যুক্ত। এই রকম পা-কে বলে লিপ্তপদ (Webbed foot)। পুরুষ ব্যাঙের বৃদ্ধ অঙ্গুলিতে থাকে কালো থাম্বপ্যাড (Thumb pad)। জনন ঋতুতে অর্থাৎ বর্ষাকালে এই অঙ্গটি স্পষ্ট হয়। ধড়ের শেষ প্রান্তের আড়াআড়ি ছিদ্রটিকে বলে অবসারণী ছিদ্র (Cloacal aperture)।

কুনোব্যাঙের আন্তরযন্ত্র ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি

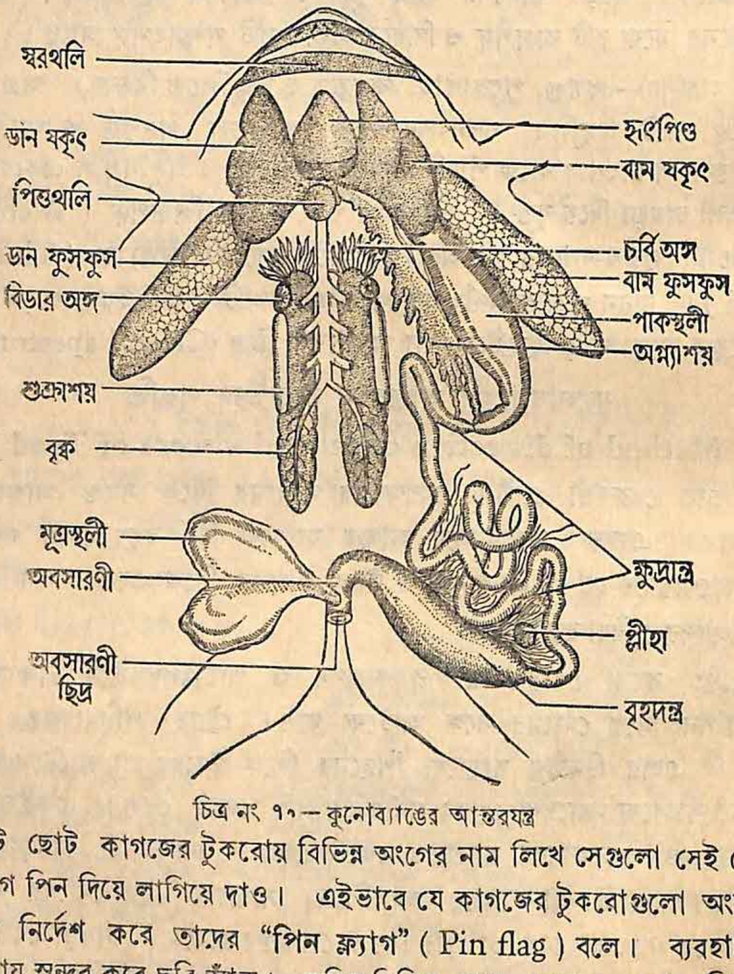
[Method of dissection of general viscera of Toad]

ব্যাঙ মেরুদণ্ডী প্রাণী। মেরুদণ্ডের সামনের দিকে সমস্ত আন্তরযন্ত্র বর্তমান। এজন্যে ক্লোরোফর্মে আচ্ছন্ন ব্যাঙকে চিৎ করে মোম গলান ট্রেতে শোয়াতে হয়। এতে বুক ও উদর উপরের দিকে চলে আসে এবং ব্যবচ্ছেদের সুবিধা হয়।

চিৎ করে শোয়ানোর পর অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ টান টান করে আলপিন দিয়ে মোমের সঙ্গে আটকে দাও। ট্রেতে পরিমাণমত জল দাও। এবার চিমটির সাহায্যে পিছনের দিকে উদরের চামড়া টেনে তুলে কাঁচির সাহায্যে মধ্যরেখা বরাবর অর্থাৎ লম্বালম্বি কেটে ফেল। একইভাবে অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের চামড়াও কেটে ফেল। এরপর ঐ চামড়াগুলি দেহের দুপাশে টানটান করে আলপিনের সাহায্যে ট্রের মোমের সঙ্গে আটকিয়ে দাও। দেখ চামড়ার নিচেই পেশীস্তর রয়েছে। চামড়া যেভাবে কেটেছো ঠিক সেইভাবেই নিচে থেকে উপর পর্যন্ত মাংসপেশী কাঁচির সাহায্যে কেটে ফেল। এক্ষেত্রে সবসময় বড় কাঁচিটি ব্যবহার করবে আর কাঁচির ভোঁতা দিকটি দেহের ভিতরে প্রবেশ করাবে ; কেননা ধারাল দিকটি

আন্তরযন্ত্রকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে। যাহোক এইভাবে পেশীস্তর কাটা হলে দেহগহ্বরটি উন্মুক্ত হয়। পেশীস্তর চিমটি ও কাঁচির সাহায্যে কেটে বাদ দাও। সম্ভব হলে চামড়ার মত একই ভাবে আলপিন দিয়ে টানটান করে আটকে দাও।

দেহগহ্বর উন্মুক্ত হলেই সমস্ত আন্তরযন্ত্র দেখা যায়। ট্রের নোংরা জল বারবার ফেলে দিয়ে কেবল পরিষ্কার জলে ব্যবচ্ছেদিত ব্যাঙটি রেখে দাও।



চিত্র নং ৭০—কুনোব্যাঙের আন্তরযন্ত্র

ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় বিভিন্ন অংগের নাম লিখে সেগুলো সেই সেই অংগে পিন দিয়ে লাগিয়ে দাও। এইভাবে যে কাগজের টুকরোগুলো অংগের নাম নির্দেশ করে তাদের "পিন ফ্ল্যাগ" (Pin flag) বলে। ব্যবহারিক খাতায় সুন্দর করে ছবি আঁক। ছবির বিভিন্ন অংশ লেবেল কর। শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে দেখিয়ে তাঁর সই নিয়ে যাও। কাজের তারিখটি ব্যবহারিক খাতার কোণায় লিখে রাখতে ভুলবে না।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। 'একক' বলিতে কি বোঝ? কোষ কি একটি একক? একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষের গঠন বর্ণনা কর।

২। কোষ কাহাকে ব:ল? একটি প্রাণিকোষের গঠন বর্ণনা কর।

৩। উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? যে কোন একটি কোষের গঠন আলোচনাকালে তোমার মতামত রাখ।

৪। **টীকা লিখ:** (ক) রবার্ট হুক, (খ) সাইটোপ্লাজম, (গ) ক্রোমোজোম, (ঘ) প্লাসটিড, (ঙ) সেণ্ট্রোজোম, (চ) মাইটোকনড্রিয়া।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

[Objective Test]

৫। **ঠিক শব্দের উপরে √চিহ্ন দাও:**

(ক) অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়াই কোষ দেখা যায় / দেখা যায় না।

(খ) প্রোটোপ্লাজম মৃত পদার্থ/জীবন্ত পদার্থ।

(গ) নিউক্লীয় জালিকা সাইটোপ্লাজমে/নিউক্লিওপ্লাজমে ছড়াইয়া থাকে।

(ঘ) কোষের সকল শক্তির উৎস ক্লোরোপ্লাসটিড/মাইটোকনড্রিয়া।

(ঙ) ক্রোমাটিন ও ক্রোমোজোমের মধ্যে সম্পর্ক আছে/সম্পর্ক নাই।

৬। **এককথায় উত্তর দাও:**

(ক) কোষের মগজ কোন্‌টি?

(খ) কোষের মধ্যে শক্তি উৎপাদক পদার্থের নাম কি?

(গ) নিউক্লীয়স বাদে কোষপ্রাকার বেষ্টিতঅর্ধতরল অংশটিকে কি বলে?

(ঘ) প্রাণিকোষে সেণ্ট্রোজোমের চার পাশে যে বিশেষ বস্তুগুলি দেখা যায় তাদের নাম কি?

(ঙ) কোষগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত রসটিকে কি বলে?

৭। **শুদ্ধ করিয়া লিখ :**

(ক) রবার্ট হুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র উন্নত মানের ছিল। (খ) যে সূক্ষ্ম পর্দায় কোষ ঢাকা থাকে তার নাম নিউক্লীওপ্লাজম। (গ) বংশগতির মূল উপাদান নিউক্লীওলস পরবর্তী জননে বয়ে নিয়ে যায়। (ঘ) নিউক্লীওলসের মধ্যে গোলাকার বিশেষ অংশটিকে গলগি বডিস বলে।

৮। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) প্রত্যেকটি কোষকেই জীবদেহ — বলা হয়।

(খ) নিউক্লীয়স হল কোষের —।

(গ) সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিশেষ — বস্তুটি হল —।

(ঘ) বংশধারার মূল উপাদান বংশ — পরম্পরায় — বয়ে নিয়ে যায়।

(ঙ) কোষ কথাটি প্রথম প্রয়োগ করেন বিজ্ঞানী · ।

(চ) উদ্ভিদকোষে নিজস্ব — আছে।

৯। **বামদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর :—**

বামদিক	ডানদিক
(ক) কোষের জীবন্ত পদার্থটির নাম	(ক) ক্রোমোজোম।
(খ) নিউক্লীয় জালিকা হইতে উৎপন্ন খণ্ড খণ্ড অংশের নাম	(খ) নিউক্লীয়স।
(গ) কোষের মগজটির নাম	(গ) প্রোটোপ্লাজম
(ঘ) প্রাণিকোষের বিশিষ্ট অঙ্গটির নাম	(ঘ) মাইটোকনড্রিয়া
(ঙ) কোষের শক্তিঘর হইল	(ঙ) সেণ্ট্রোজোম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

।। সাধারণ প্রশ্ন ।।

১। 'কলা' কাহাকে বলে? উদ্ভিদের সরল ও জটিল কলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। তোমার পঠিত কোন দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে সরল ও জটিল কলাগুলির অবস্থান চিত্র মাধ্যমে লেবেল করিয়া দেখাও।

৩। একটি ভুট্টা কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের দৃশ্য আঁকিয়া লেবেল কর এবং অংশগুলির বর্ণনা দাও।

৪। একবীজপত্রী কাণ্ডকে কিভাবে দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড হইতে চিনিয়া লইবে?

৫। কোন্ বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ দেখিয়া কাণ্ড ও মূলের প্রস্থচ্ছেদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়?

৬। একটি পাতার অভ্যন্তরীণ গঠন বর্ণনা কর।

৭। **টীকা লিখ:** (ক) কলাস্থান, (খ) স্ক্লেরেনকাইমা, (গ) ক্যামবিয়ম, (ঘ) শ্বেতসার স্তর, (ঙ) অধস্ত্বক, (চ) মেসোফিল, (ছ) পত্ররন্ধ্র।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

[Objective Test]

৮। **সঠিক শব্দের উপরে ✓ চিহ্ন দাও**

(ক) বহিরাকৃতি সম্বন্ধে পঠন পাঠন জীববিজ্ঞানের যে শাখায় হয় তাহাকেই কলাস্থান/শারীরতত্ত্ব বলে।

(খ) পাতলা কোষপ্রাকার বেষ্টিত কলাগুলিকে স্ক্লেরেনকাইমা / প্যারেনকাইমা বলে।

(গ) জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে অবস্থিত ভাজক কলার নাম ক্যামবিয়ম/মজ্জা

(ঘ) রক্ষীকোষ বেষ্টিত পাতার ছিদ্রকে শ্বাসগহ্বর/পত্ররন্ধ্র বলে।

(ঙ) পাতার দুই ত্বকের মধ্যবর্তী প্লাসটিড সমৃদ্ধ কলাকে জাইলেম/মেসোফিল বলে।

৯। **এককথায় উত্তর দাও:**

(ক) পাতার উপরের স্তরকে কি বলে?

(খ) প্রত্যেক বাণ্ডিলকে ঘিরে পাতায় যে প্যারেনকাইমা আচ্ছাদন আছে তাহার নাম কি?

(গ) মূলের বাহিরের ত্বক হইতে কি উৎপন্ন হয়?

(ঘ) জাইলেমের মধ্য দিয়া কি প্রবাহিত হয়।

(ঙ) দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড বা মূলের কর্টেক্সের একেবারে ভিতরের স্তরটির নাম কি?

১০। **শুদ্ধ করিয়া লিখ ঃ**

(ক) জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে একটি জটিলকলা ও অন্যটি সরলকলা।

(খ) প্যারেনকাইমার কোষপ্রাকার সর্বদাই স্থূল।

(গ) দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি এলোমেলো ভাবে ছড়ান থাকে।

(ঘ) কাণ্ডের মূলরোম বহুকোষী।

১১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) উদ্ভিদদেহের খাদ্য চলাচলের পথকে — বলে।

(খ) সূর্যমুখী কাণ্ডের অন্তস্ত্বকের অপর নাম —।

(গ) কাণ্ডের কেন্দ্রস্থ কলাকে — বলে।

(ঘ) জাইলেম ও — প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা যোগায়।

(ঙ) দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি — সাজান থাকে।

(চ) মূলরোম সর্বদাই —।

১২। **বামদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর।**

বামদিক	ডানদিক
(ক) পাতার ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের আবরণকে বলে	(ক) পত্ররন্ধ্র।
(খ) পাতার ত্বকের ফাঁকা স্থানগুলিকে বলে	(খ) বাণ্ডিল আচ্ছাদন।
(গ) পাতার উর্ধ্বত্বক-সংলগ্ন স্তম্ভাকার সুবিন্যস্ত স্তরকে বলে	(গ) কোষান্তর রন্ধ্র।
(ঘ) প্যারেনকাইমা কোষের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানগুলিকে বলে	(ঘ) প্যালিসেড প্যারেনকাইমা।
(ঙ) জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী ভাজক কলার নাম	(ঙ) ক্যামবিয়ম।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। 'কলা' কাহাকে বলে ? বিভিন্ন প্রকার আবরণী কলা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। যোগকলা বলিতে কি বোঝায় ? যোগকলার সচিত্র বিবরণ দাও।

৩। পেশীকলা ও কঙ্কালতন্ত্রের মধ্যে সম্বন্ধ কি? পেশী কয় প্রকার তাহাদের কার্যাবলী বিবৃত কর।

৪। 'অঙ্গ' কাহাকে বলে? বিশেষ কোন তন্ত্রে যে যে অঙ্গ দেখা যায় সেগুলির নাম কর।

৫। নার্ভকলা সম্বন্ধে তোমার ধারণা সংক্ষেপে ব্যক্ত কর।

৬। **টীকা লিখ :** (ক) স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ম, (খ) সিলিয়েটেড এপিথেলিয়ম, (গ) এরিওলার কলা, (ঘ) সংবহন কলা, (ঙ) অ্যাক্সন।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

[Objective Test]

৭। **সঠিক শব্দের উপরে √ চিহ্ন দাও**

(ক) কার্টিলেজ কঠিন/নরম কলা।

(খ) অনুচক্রিকা অস্থি/রক্তরসে ভাসিয়া বেড়ায়।

(গ) হৃৎপেশী ঐচ্ছিক/অনৈচ্ছিক।

(ঘ) অ্যাক্সনের মধ্য দিয়া রস/উদ্দীপনা পরিবাহিত হয়।

(ঙ) রেচনতন্ত্রের মধ্য দিয়া বাতাসের/নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থের আদানপ্রদান ঘটে।

৮। **এককথায় উত্তর দাও :**

(ক) অস্থিকোষগুলি বিক্ষিপ্তভাবে কিসের মধ্যে ছড়ানো থাকে?

(খ) লোহিত কণিকা কেন লাল দেখায়?

(গ) যোগকলায় ফিকে রংয়ের ঢেউ-খেলানো তন্তুগুলির নাম কি?

(ঘ) রস নিঃসৃত করা কোন্ কলার বৈশিষ্ট্য?

(ঙ) কোন্ কলা কোমলাস্থি ও অস্থি লইয়া গঠিত?

৯। **শুদ্ধ করিয়া লিখ :**

(ক) পীতবর্ণের তন্তুগুলি কখনই শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয় না।

(খ) সংজ্ঞাবহ কোষগুলি সর্বদাই গ্রন্থিময়।

(গ) অস্থি অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক।

(ঘ) লোহিত কণিকা দেহরক্ষীর কাজ করে।

১০। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) একাধিক স্তরে সজ্জিত আবরণী কলাকে — কলা বলে।

(খ) স্থলজ — শ্বাসনালীতে — এপিথেলিয়ম আছে।

(গ) অধিকাংশ অমেরুদণ্ডীর দেহের — একটি — সজ্জিত।

(ঘ) শ্বেততন্তু প্রধানতঃ — থাকে।

(ঙ) বন্ধনী এবং — কলা দিয়েই গঠিত।

(চ) হৃৎপিণ্ডের পেশীকে — বলে।

(ছ) নার্ভতন্ত্রের এককে — বলে।

১১। **বামদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর।**

বামদিক	ডানদিক
(ক) জীবদেহ যে কোষগুলি দ্বারা গঠিত সেগুলিকে বলে	(ক) জনন কোষ।
(খ) বংশবিস্তারের সহিত জড়িত পুং ও স্ত্রী কোষকে বলে	(খ) ক্যালসিয়ম ফসফেট।
(গ) অস্থির প্রধান উপাদান	(গ) সোমাটিক কোষ।
(ঘ) সূক্ষ্ম ও শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত এরিওলার কলার তন্তুগুলি হইল	(ঘ) মেডালা।
(ঙ) পিঠ, বুক, পেট প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে থাকে।	(ঙ) ইলাসটিক।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। পাচনতন্ত্রে কোন্ কোন্ অঙ্গ অপরিহার্য? আরশোলার পাচনতন্ত্রের ছবি আঁকিয়া ঐ অংশগুলি দেখাও।

২। আরশোলার শ্বাসতন্ত্রের প্রধান অঙ্গগুলি কি? কিভাবে আরশোলার শ্বসন চলে চিত্র মাধ্যমে দেখাও।

৩। আরশোলার জননতন্ত্র সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। কেঁচোর পাচনতন্ত্র বর্ণনা কর।

৫। 'হৃৎপিণ্ড' কাহাকে বলে? কেঁচোর কি প্রকৃত হৃৎপিণ্ড পাওয়া যায়? কেঁচোর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁক।

৬। রেচন বলিতে কি বোঝ? কেঁচোর রেচন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৭। কেঁচোর জননতন্ত্র বর্ণনা কর।

৮। ব্যাঙ ও মানুষের করোটির তুলনা কর।

৯। 'শ্রোণীচক্র' কাহাকে বলে? ব্যাঙের শ্রোণীচক্র বর্ণনা প্রসঙ্গে মানুষের শ্রোণীচক্রের সহিত সম্বন্ধ আলোচনা কর।

১০। ব্যাঙ ও মানুষের পাচনতন্ত্রের মধ্যে কোথায় কোথায় সাদৃশ্য আছে দেখাও।

১১। ব্যাঙের রক্তসংবহন অংশগ্রহণকারী প্রধান অঙ্গগুলির নাম কর। কিভাবে ব্যাঙের রক্তসংবহন ঘটে।

১২। 'শ্বসন' কাহাকে বলে? ব্যাঙের ও মানুষের শ্বসন পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা কর।

১৩। ব্যাঙের রেচন অঙ্গ ও মানুষের রেচন অঙ্গে কোন সাদৃশ্য থাকিলে চিত্র আঁকিয়া দেখাও।

১৪। **টীকা লিখ:**

(ক) ট্রাকিওল, (খ) ম্যালপিজিয়ান নালিকা, (গ) শ্বাসরন্ধ্রক, (ঘ) ওভারিওল, (ঙ) চক্রপেশী, (চ) আন্ত্রসিকম, (ছ) কেঁচোর হৃৎপিণ্ড, (জ) নেফ্রিডিয়ম, (ঝ) প্রষ্টেটগ্রন্থি, (ঞ) জনন পিড়কা (ট) করোটিক, (ঠ) কশেরুকা, (ড) ইলিয়ম। (ঢ) শ্রোণীচক্র, (ণ) ডিওডিনম, (ত ট্রাঙ্কাস আর্টিরিওসস, (থ) অ্যালভিওলাই, (দ) সংগ্রাহক নালিকা।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

[Objective Test]

১৫। **সঠিক শব্দের উপরে ✓ চিহ্ন দাও।**

(ক) উধ্বর্চোয়াল ওঠানামা করে/করে না।

(খ) কশেরুকার মধ্যে ফাঁক থাকে/ফাঁক থাকে না।

(গ) ব্যাঙের অগ্রপদের প্রগণ্ডাস্থিটি সবচেয়ে লম্বা/ছোট অস্থি।

(ঘ) ব্যাঙের মুখবিবরে লালাগ্রন্থি আছে/নাই।

(ঙ) গলবিল অন্ত্রের/মুখবিবরের পরের অংশ।

(চ) অগ্ন্যাশয় রক্তসংবহনে/পরিপাকে অংশগ্রহণ করে।

১৬। **এককথায় উত্তর দাও:**

(ক) ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে পাতলা প্রাকারযুক্ত ত্রিভুজাকৃতি যে প্রকোষ্ঠটি আছে তাহার নাম কি?

(খ) ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে তিনটি মহাশিরা কোন্ অংশে মিলিত হয়?

(গ) রক্তের গতিপথ কাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ?

(ঘ) বিশুদ্ধ রক্ত কোন্ নালীপথে পরিচালিত হয় ?

(ঙ) ব্যাঙের রেচনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ কি ?

(চ) পিত্ত কোথায় সাময়িকভাবে জমা থাকে ?

১৭। **শুদ্ধ করিয়া লিখ:**

(ক) কশেরুকা বুকের খাঁচা তৈরী করে। (খ) রেডিয়স ও আলনা একত্রে পশ্চাৎপদ গঠন করে। (গ সেক্রম অস্থিটি উরশচক্রে অবস্থিত। (ঘ) টনসিল অন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত। (ঙ) ভারমিফর্ম অ্যাপেনডিক্স গলবিলের অংশ। (চ) মানুষের হৃৎপিণ্ডে সাইনস ভেনোসস আছে।

১৮। **শূন্যস্থান পূরণ কর:**

(ক) হৃৎপিণ্ড থেকে যে নালীপথে রক্ত বাহিত হয় তাকে —— বলে।

(খ) মানুষের সংবহনতন্ত্রে —— ও —— রক্তের সংমিশ্রণ ——।

(গ) মূত্রস্থলী থেকে —— নির্গত হয়।

(ঘ) ব্যাঙের নিলয়ের —— উভয় রক্তের মিশ্রণ ঘটে।

(ঙ) পাকস্থলী ও গ্রহণীর মধ্যস্থলে ব্যাঙের —— অবস্থিত।

(চ) রক্তসংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ —।

(ছ) ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের — পাতলা প্রকারযুক্ত — যে আছে তাহাকে বলে —।

(জ) মানুষের — ও — সংযোগস্থলে বদ্ধ থলির মত যে অঙ্গটি আছে তাহাকে — বলে।

(ঝ) রক্তবাহের মধ্যে রক্তের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে —।

১৯। **বামদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর।**

বামদিক	ডানদিক
(ক) আটটি যকৃত শিকা	(ক) আরশোলার শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ।
(খ) স্পন্দনশীল চার জোড়া রক্তবাহ	(খ) আরশোলার পাচনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।
(গ) শ্বাসছিদ্র ও শ্বাসনালী	(গ) কেঁচোর–বিকল্প হৃৎপিণ্ড।
(ঘ) বৃহদন্ত্রের শেষাংশ অবসারণী	(ঘ) কেঁচোর রেচনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ।
(ঙ) সেপ্টাল নেফ্রিডিয়া	(ঙ) ব্যাঙের পাচন তন্ত্রের অন্তর্গত।
(চ) সীম বীজের আকৃতিবিশিষ্ট বৃক্ক	(চ ব্যাঙের রক্তসংবহনতন্ত্রের প্রধান অংশ
(ছ) ত্রিভুজাকৃতি সাইনস ভেনোসস	(ছ) মানুষের দেহে দেখা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। 'ব্যাপন' কাহাকে বলে? এই প্রক্রিয়াটির সহিত গাছের সম্পর্ক কি?

২। অভিস্রবণ বলিতে কি বোঝ? পরীক্ষাগারে অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি কিভাবে দেখাও বর্ণনা কর।

৩। 'কোষান্তর অভিস্রবণ' কাহাকে বলে? কোষান্তর অভিস্রবণের একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

৪। 'আলু অসমোস্কোপ' —এর সাহায্যে কি প্রমাণ করা যায়?

৫। শোষণ কথার অর্থ কি? উদ্ভিদদেহে কিসের শোষণ ঘটে? মূল দ্বারা জল শোষণের পরীক্ষা কর।

৬। পরিবহণ পদ্ধতিটি কি? উদ্ভিদদেহে রস পরিবহণের একটি সহজ পরীক্ষা ব্যক্ত কর?

৭। 'বাষ্পমোচন' কাহাকে বলে? উদ্ভিদদেহে বাষ্পমোচনের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

৮। **টীকা লিখঃ** (ক) ব্যাপন, (খ) আলু অসমোস্কোপ, (গ) বাষ্পমোচন, (ঘ) অন্তঃঅভিস্রবণ, (ঙ) শোষণ।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

[Objective Test]

৯। **সঠিক শব্দের উপর ✓ চিহ্ন দাও।**

(ক) সমঘনত্বযুক্ত দুইটি তরলের মধ্যে অভিস্রবণ ঘটে/ঘটে না।

(খ) কিশমিশ ঘনরস/জল শোষণ করিতে পারে।

(গ) রস টেনে নেওয়ার পদ্ধতিকেই শোষণ/অভিস্রবণ বলে।

(ঘ) উদ্ভিদ সহজে কঠিন খাদ্য/তরল খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

(ঙ) বাষ্পমোচন সদাসর্বদা/দিবাভাগে চলে।

১০। **এককথায় উত্তর দাওঃ**

(ক) গাছের সর্বাঙ্গে জল ছড়িয়ে পড়ার জন্য কোন্ পদ্ধতি সাহায্য করে?

(খ) কোন্ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ উদ্বৃত্ত জল ত্যাগ করে?

(গ) মূলরোম কোন্ পদ্ধতিতে মাটির রস শোষণ করে?

(ঘ) রস পবিবহণ কোন্ অংশের মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়?

১১। শুদ্ধ করিয়া লিখ :

(ক) পরিবহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রসশোষণ ঘটে।
(খ) পর্দার দ্বারা পৃথ কীকৃত দুইটি তরলের মধ্যে ব্যাপনক্রিয়া চলে।
(গ) যে প্রক্রিয়ার উদ্বৃত্ত জল পরিত্যক্ত হয় তাহাকে ব্যাপন বলে।
(ঘ) সংবহনের ফলে গাছের দেহ ঠাণ্ডা থাকে।

১২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) রসের স্রোত বজায় রাখার — বিশেষ সহায়তা করে।
(খ) — বাষ্পমোচন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে।
(গ) — টেনে নেওয়া পদ্ধতিকেই বলে —।
(ঘ) কম ঘনত্বের তরল যখন বেশী ঘনত্বের তরলের দিকে ছুটে যায় তাকে — বলে।

১৩। বামদিকের বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর।

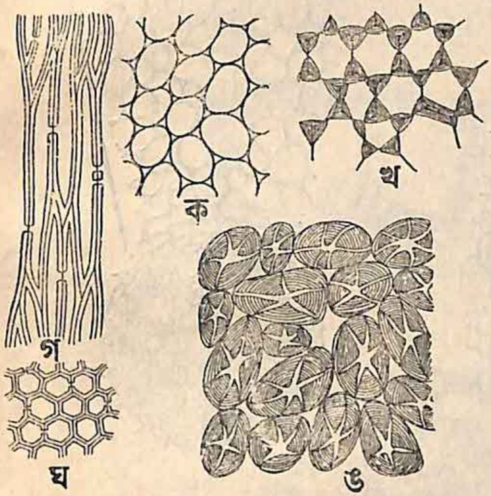
বামদিক	ডানদিক
(ক) বেশী ঘনত্বের পদার্থের অল্প ঘনত্বের পদার্থের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতাকে	(ক) অভিস্রবণ বলে।
(খ) জীবন্ত উদ্ভিদকোষে রস টেনে নেওয়ার পদ্ধতিকে	(খ) ব্যাপন বলে।
(গ) পার্চমেণ্ট পর্দা দ্বারা পৃথক অসমঘনত্বের তরলের মধ্যে সমতা আসার প্রবণতাকে	(গ) শোষণ বলে।
(ঘ) একস্থান হইতে অন্য স্থানে খাদ্য প্রেরণ পদ্ধতিকে	(ঘ) বাষ্পমোচন বলে।
(ঙ) উদ্ভিদদেহের উদ্বৃত্ত জল বাষ্পাকারে ত্যাগ করার পদ্ধতিকে	(ঙ) পরিবহণ বলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

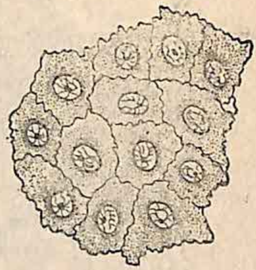
১। কাণ্ড ও মূলের দুইটি ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে কিভাবে চিনিবে?
২। পাতার অন্তঃগঠনে কি কি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে?
৩। আরশোলার বহিরাকৃতির ছবি আঁক ও লেবেল কর।
৪। ব্যাঙের বহিরাকৃতির ছবি আঁক ও লেবেল কর।
৫। ব্যাঙের আন্তরযন্ত্র ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ছবির মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা
(Objective Test through diagrams)

১। কোন ধরণের ও কি কলা ?



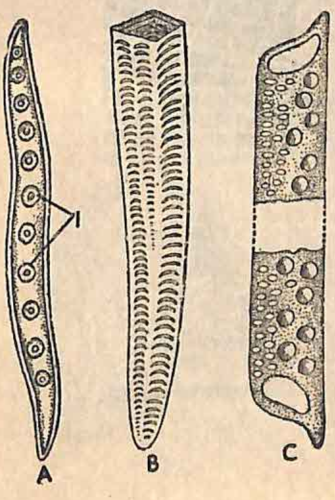
(১)



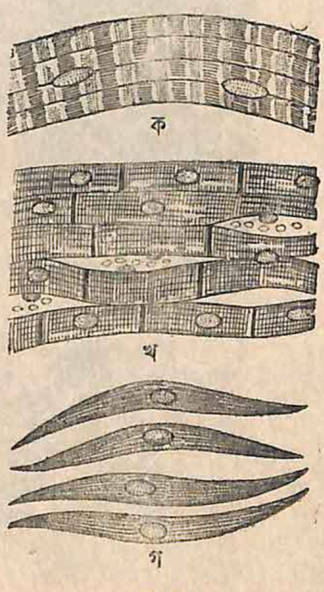
(২)



(৩)

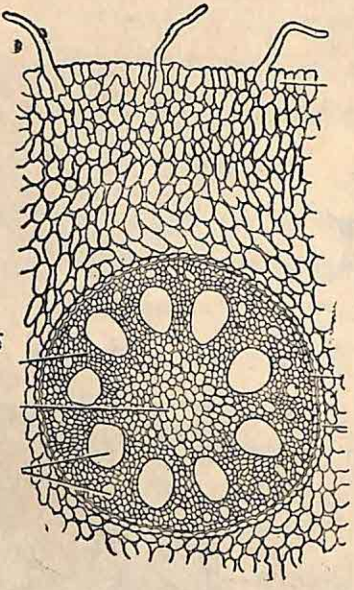


(৪)

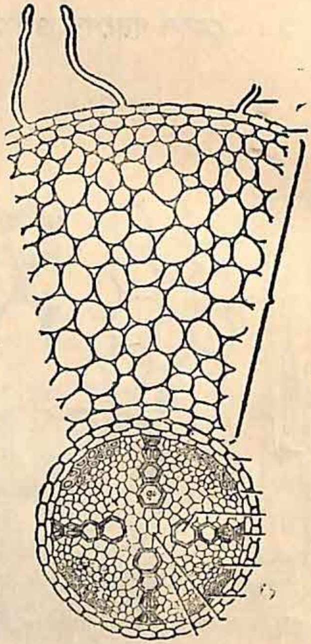


(৫)

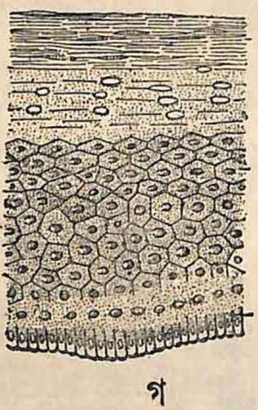
২। 'কোনটি কোন অঙ্গের ছেদ এবং কেন? বিভিন্ন অংশগুলির লেবেল কর।



ক



খ

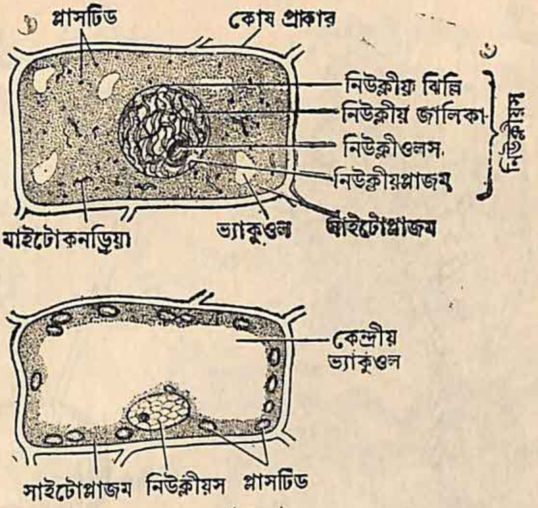


গ

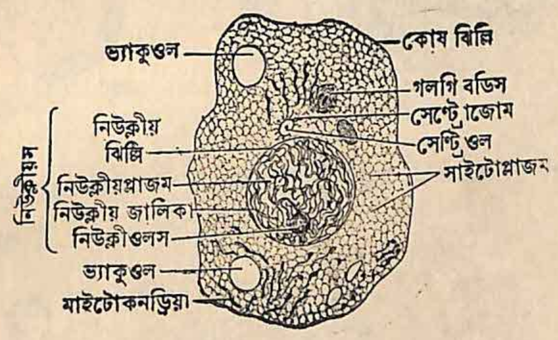


ঘ

৩। কি কোষ ও কেন ?



(ক)



(খ)

৪। কোন প্রাণীর কোন তন্ত্র এবং কেন ?

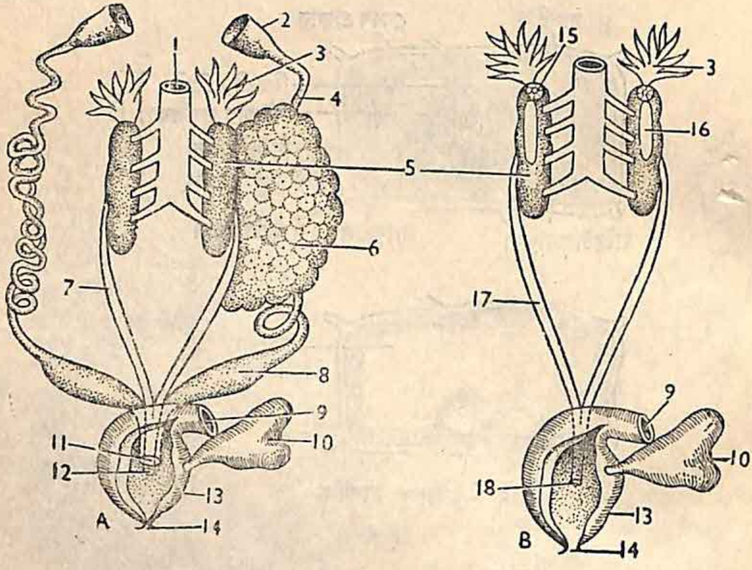


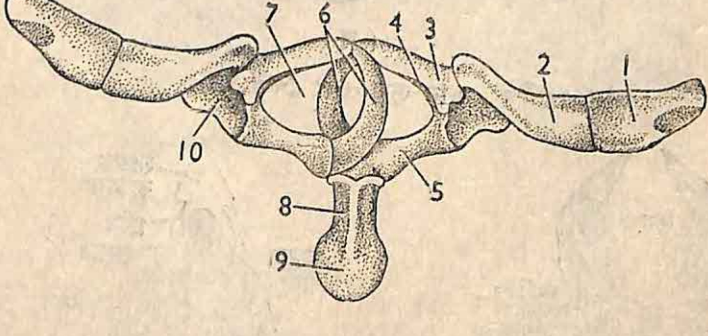
(ক)



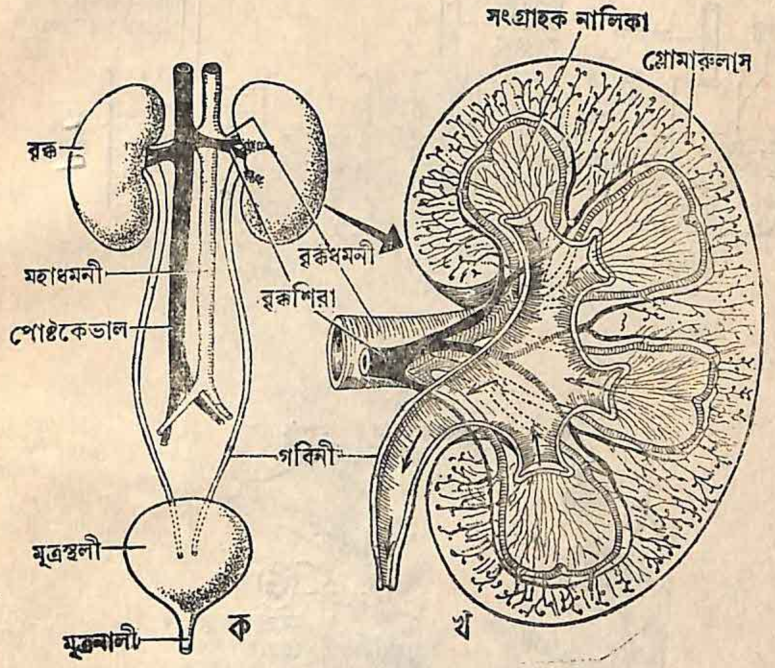
(খ)

৫। কোন প্রাণীর কি অঙ্গ বল এবং অংশগুলি লেবেল কর।

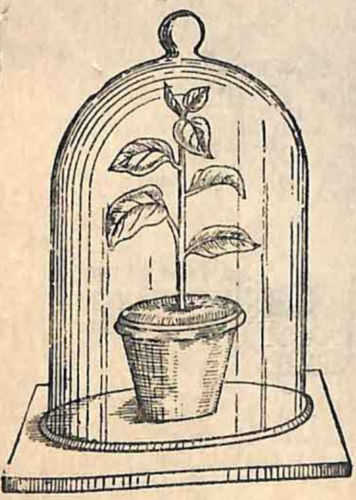




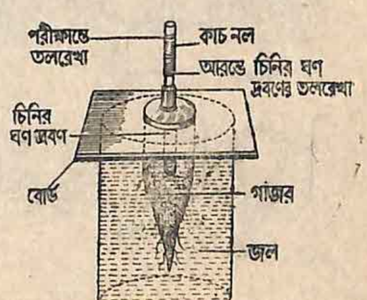
৬। কোন প্রাণীর কি তন্ত্র বল এবং অংশগুলির কাজ বল।



৭। নিচের পরীক্ষাপাত্র কোন পরীক্ষায় কিভাবে ব্যবহৃত হয় ?

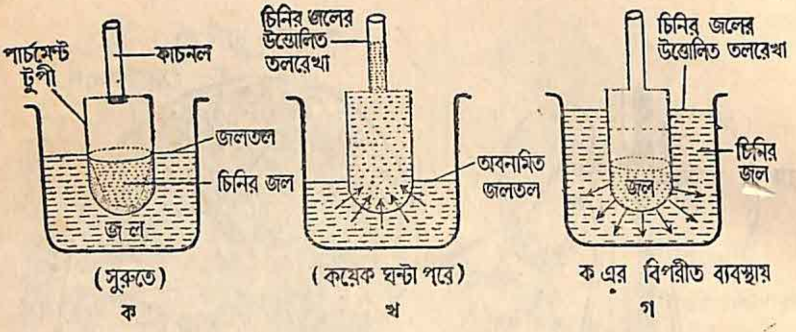


(ক)

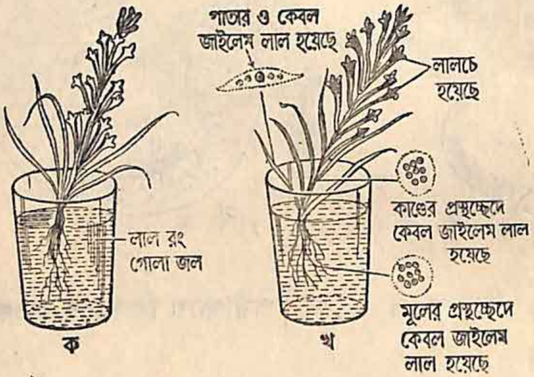


(খ)

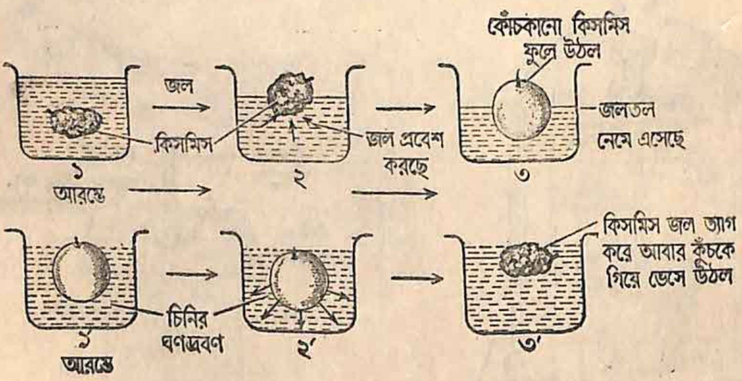
৮। নিচের পরীক্ষাগুলি হইতে কি সিদ্ধান্তে আসা যায় ?



(১)

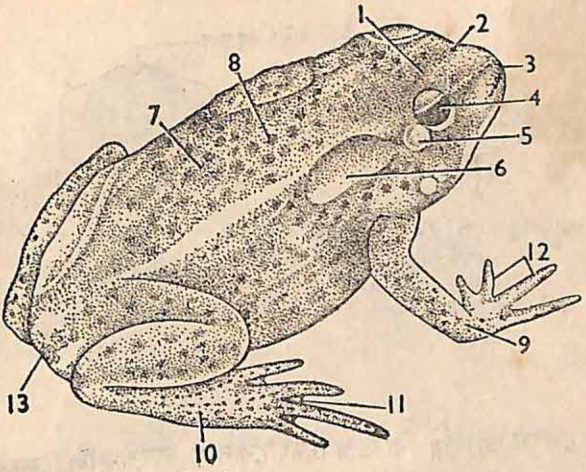


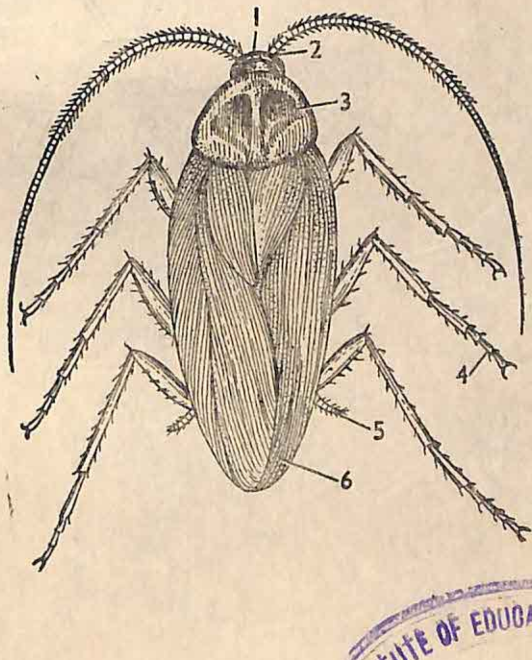
(২)



(৩)

৯। নিচের প্রাণীগুলির বিভিন্ন অংশ লেবেল কর এবং অঙ্গগুলির কাজের উল্লেখ কর।





১০। নিচের পরীক্ষা পাত্রের ব্যবস্থা কেন এবং কিভাবে করা হইয়াছে বল।



১১। কোন প্রাণীর কি তন্ত্র এবং কেন? অংশগুলি লেবেল কর।

